

প্রথম অধ্যায় উৎপল দত্ত মানুষ ও নাট্যকার

বাংলা নাটক ও অভিনয়ের জগতে উৎপল দত্ত এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক, তাত্ত্বিক, বক্তা, সংগঠক এবং অক্লান্ত পরিশ্রমী এক নিষ্ঠাবান নাট্যকর্মী। তাঁর এই নানা ভূমিকার মূলে আছে মার্কসবাদের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস। সমাজ পরিবর্তনের কারিগর তিনি। মার্কসবাদই তাঁর দর্শন যাকে নির্ভর করে তিনি সমাজ পরিবর্তনের কাজ করেন। বহু অভিধায় ভূষিত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তিনি এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। এক দিকে তাঁর মধ্যে নানা গুণের সমন্বয় ঘটেছিল; অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন সহজ সরল মার্জিত উদার প্রকৃতির মানুষ। উৎপল দত্ত —

“মানুষ হিসেবে ভীষণ রসিক এবং অতি জীবন্ত মানুষ ছিলেন। উদার ছিলেন মনের দিক থেকে। তবে হ্যাঁ, তাঁর চার পাশে এমন একটা প্রাচীর ঘেরা থাকত যে, কোনো মানুষ অতি সহজে তাঁর কাছে যেতে পারতেন না। বোধ হয় বংশগত গরিমার প্রাচীর। কিন্তু সেই প্রাচীর টপকে যে উৎপল দত্তর কাছে যেতে পেরেছে, সে পেয়েছে একজন শিক্ষককে, পেয়েছে একজন বন্ধুকে, পেয়েছে একজন পথ-প্রদর্শককে।”

তিনি সারাজীবন ধরে নাট্যচর্চা করে গেছেন। তাঁর নাটকে রাজনীতি ও নন্দনতত্ত্বের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। বিশ্বনাট্যতত্ত্ব বিশেষত শেক্সপিয়ারের নাট্যভাবনা ও তাঁর প্রয়োগকলাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছিলেন। রাজনীতি ও শিল্পের অভিন্ন সম্পর্কের ভাবনায় নাটকের পরিকাঠামোয় তিনি ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনার দলিল নির্মাণ করেছেন। আঙ্গিকগত প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সঠিক ভাবে পরম্পরা ও আধুনিকতার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বিষয় ভাবনায় আধুনিকতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতীয় নাট্যচর্চার প্রাঙ্গণে এমন সর্বজনীন ও শক্তিশালী প্রতিভা খুবই কম।

বাংলা নাট্য জগতে সর্বহারা মানুষের সাংস্কৃতিক ও সমাজবিপ্লবের অন্যতম ভাষ্যকার হলেন উৎপল দত্ত। তাঁর বর্ণনাময় ব্যক্তিত্ব ষাট-সত্তরের দশকের দিনগুলিতে বঞ্চিত মানুষের প্রেরণার উৎস ছিল। তাঁর মতে কোন শিল্পী বা স্রষ্টাই রাজনীতি নিরপেক্ষ নন। কারো ক্ষেত্রে একটু বেশি, কারো ক্ষেত্রে বা এই দায়বদ্ধতা একটু কম। তবে উৎপল দত্তের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা যে তাঁর সমগ্র জীবনে পরিকীর্ণ, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবন ব্যাপী নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনার কৃতিত্বে। তিনি নাটকের মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁর

আদর্শকে প্রচার করে যেতে চান একথা তিনি নির্দিধায় বলতে পারতেন। সে কারণে—“তাঁর নাটক হয়ে উঠেছিল ‘এজিট প্রপ’ যা ছিল কিনা একদিকে এজিকেশন, অন্যদিকে প্রোপাগাণ্ডা। প্রতিবাদী এই নাট্যকারের নাটক ছিল বিপ্লবের বিশ্বাসে ভরা। তাই তিনি এজিটেটর এবং প্রোপাগাণ্ডিস্ট।”^২

উৎপল দত্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গিয়েছিলেন। এ সব দেশে গিয়ে তিনি নাট্যমঞ্চ প্রযোজনা, পরিচালনা এবং অভিনয়রীতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এই সকল বিষয়ে ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলা নাটক অভিনয়, পরিচালনা, প্রযোজনা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে এক অন্য মাত্রা অর্জন করে।

“বাংলা নাটক এমন সুদৃঢ় রাজনীতি ও ইতিহাস-নির্ভর কোনওদিন ছিল না। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এমন বিতর্কিত তীক্ষ্ণবী ব্যক্তিত্বও স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গে খুব বেশি দেখা যায়নি। সম্ভবত বাংলা নাট্যজগতে উৎপল দত্ত একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে বিশ্ব নাট্য আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও নৈকট্য গড়ে উঠেছিল।”^৩

উৎপল দত্তের ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্য হয়তো অনেক সময় নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে একথা সত্য, তাহলেও কিন্তু বহুমান্দ্রিক প্রতিভার আধার হিসেবে বাংলা নাট্যজগৎ তথা বাংলা সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর নাম চিরদিনের জন্য বিপুল বৈভবে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

জন্ম ও পরিচিতি : উৎপল দত্তের জন্ম ২৯শে মার্চ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে, বর্তমান বাংলা দেশের বরিশালে। কিন্তু অরুণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন উচ্চ সাংস্কৃতিকবোধের চাহিদায় তিনি শৈশবের শিলং শহরকেই নিজের জন্মস্থান বলে নির্দেশ করতে পছন্দ করতেন। এক্ষেত্রে দর্শন চৌধুরীর ব্যাখ্যা—“উৎপলের জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন বাংলা দেশের বরিশাল জেলায়। উৎপল নিজে জানিয়েছেন, তার জন্ম শিলং এর মামা বাড়িতে।”^৪ তাঁর আদি নিবাস ছিল কুমিল্লা জেলায়। তাঁর পিতামহ দ্বিজদাস দত্ত। পিতা গিরিজারঞ্জন দত্ত। পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে উৎপল ছিলেন চতুর্থ সন্তান। পিতৃদত্ত নাম ছিল উৎপলরঞ্জন দত্ত। ডাক নাম শঙ্কর। পারিবারিক গুরু ভোলানন্দ গিরি এ নাম দিয়েছিলেন। আধুনিক শিক্ষায় উদ্দীপিত হয়ে উৎপল এ নাম পরিহার করেন। এমন কি ভালো নাম উৎপলরঞ্জন -এর ‘রঞ্জন’ শব্দটিও বর্জন করেন। পরবর্তীকালে উৎপল দত্ত নামটিই সর্বত্র ব্যবহার করেছেন।

তাঁর পিতা গিরিজারঞ্জন দত্ত প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন।

পরবর্তীকালে তিনি ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার পদে নিযুক্ত হন। কর্ম উপলক্ষে তাঁকে নানা জায়গায় বদলি হতে হত। এজন্য তিনি প্রথমে শৈল শহর শিলং এবং পরে কোলকাতায় পুত্র কন্যাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

শিক্ষাজীবন : বাবার চাকরি বহু জায়গায় বদলি হওয়ার জন্য ভাই-বোনেদের সঙ্গে উৎপলকেও নানা স্থানে ঘুরতে হয়েছে। অবিভক্ত বাংলার নানা প্রতিষ্ঠানে তাঁকে পড়াশোনা করতে হয়েছে। উৎপলের প্রথম পাঠ শুরু হয় মামার বাড়ি শিলং -এ। ১৯৩৫ সালে শিলং-এর সেন্ট এডমণ্ডস স্কুলে তাঁর শিক্ষা জীবনের সূচনা। তারপর বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলেও তিনি কিছুদিন পড়েন। তাঁর বাবা তখন বহরমপুর জেলের জেলার ছিলেন। এরপর ১৯৩৯ সালে গিরিজারঞ্জন কলকাতায় বদলি হন। তখন তাঁরা সপরিবারে বালিগঞ্জ এলাকার অভিজাত পরিবেশে বাস করতে শুরু করেন। ১৯৩৯ সালে দশ বছর বয়সে উৎপলকে তাঁর এক ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতার সেন্ট লরেন্স স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু স্কুল বাড়িটি সেনাবাহিনী দখল করে নিলে সেন্ট লরেন্স স্কুল অস্থায়ীভাবে দমদমে উঠে যায়। তখন ১৯৪৩ সালে তিনি বাড়ির কাছাকাছি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৪৫ সালে এখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হন।

উৎপল দত্তের কলেজ জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। তখন তাঁরা সপরিবারে বাস করতেন ‘সিডলি হাউস’-এ, ১১৭ নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলেজে শুরু হল তাঁর নতুন জীবন। তিনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন বিচিত্র বিদ্যায়। “বিশেষ করে ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, দেশি-বিদেশী সঙ্গীততত্ত্ব, নাটক এবং ধ্রুপদী সাহিত্য পাঠে মনোনিবেশ করলেন। চলচ্চিত্রে আগ্রহ, নাটকে অভিনয়, প্রবন্ধ রচনা, আবৃত্তি, বিতর্ক - যেন ভবিষ্যৎ উৎপলের ভূমিকা লেখা হল।”^৬ ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের প্রথম বর্ষে কলেজ পত্রিকায় তাঁর দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এগুলি হল ‘A Glance at Modern Russian Literature’ এবং ‘বাস্তবতা ও বাংলা সাহিত্য’ দ্বিতীয় বর্ষে- ১৯৪৭ সালে জুলাই মাসে কলেজ পত্রিকায় আরো দুটি প্রবন্ধ লেখেন— ‘Three Bengali Novelists’ এবং ‘সিম্ফনি’। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের কলা বিভাগে প্রথম ছাত্র ছিলেন উৎপল দত্তই। কনসার্ট পিয়ানিস্ট হবার খুবই ইচ্ছা ছিল তাঁর। সে উদ্দেশ্যেই তিনি পার্কস্ট্রিটের মিসেস গ্রীন হলের কেবিনা দেলা মুজিকায় ভর্তি হন।

কলেজের পড়াশুনার সঙ্গে তিনি একান্তে শেক্সপিয়ারের নাটকগুলি পড়তে থাকেন।

শুধু নাটক অভিনয় নয়, নাটক ও নাট্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বইপত্রও পড়তে থাকেন। এসময়েই তিনি শেক্সপিয়ার, পিটার ব্রুক, স্তানিস্লাভস্কি প্রমুখ জগৎ বিখ্যাত নাট্য প্রযোজকদের ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। এ সময় থেকেই শেক্সপিয়ারের নাটকের সঙ্গে উৎপলের একটা হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

“কলেজ জীবন থেকেই তিনি নাট্য সম্পর্কিত গ্রন্থাদি এবং পত্রপত্রিকা পড়ার অবসরে মার্কস, এঙ্গেলস, হেগেল -এর রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হতে থাকেন। মার্কসবাদ-লেলিনবাদ এবং রাজনৈতিক শিল্প-সাহিত্য তাঁকে নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। তাঁর নাট্যভাবনার সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবনার সংমিশ্রণ এখানে থেকেই শুরু।”^৬

আই.এ. পাশ করার পর ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে পড়তে থাকেন উৎপল দত্ত। ইংরেজির পাশাপাশি ইতিহাস বিষয়ের উপর তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল।

কলেজ জীবনের চার বছর—ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে দু’বছর এবং বি.এ. ক্লাসে দু’বছর তিনি কলেজে প্রথম স্থান অধিকার করে শ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে ইংরেজি অনার্সে তিনিই ছিলেন কলেজের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষায় তিনি সম্ভবত পঞ্চম স্থান অধিকার করেন, কিন্তু কলেজের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী ছিলেন। ১৯৪৯ সালে উৎপল দত্ত ইংরেজি অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এসময়ে তিনি সাংবাদিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন ‘দ্য স্টেটসম্যান’ -এ কোর্ট রিপোর্টার রূপে। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি এ কাজ ছেড়ে দেন।

নাট্যজীবনের সূচনা বা সেন্ট জেভিয়ার্স পর্বঃ স্কুল জীবনেই উৎপলদত্তের নাটক ও নাটক অভিনয়ে হাতে খড়ি। “উৎপলের নাট্য জীবনের শুরু সেন্টলরেন্স স্কুলে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে নাট্যাভিনয়ের সূত্রে যেতে হত সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সেখানে, কাজ করেছেন নেপথ্যে।”^৭ ১৯৪৩ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে তিনি যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র, সেসময়ে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজের যৌথ উদ্যোগে সাঁ সুঁসি প্লেয়ার্স প্রযোজিত ফাদার উইভার পরিচালিত ‘হ্যামলেট’ নাটকের দ্বিতীয় কবর খনকের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। সেই সময় থেকেই নাটক ও মঞ্চ প্রসঙ্গে তিনি গভীর ভাবে পড়াশোনা করতে থাকেন। নিয়মিত সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার পঠন পাঠনের মাধ্যমে তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত লালফৌজের প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমের ঘটনায় তাঁর

কিশোর মনের প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ ঘটে। স্কুলে থাকতেই সাম্যবাদী ভাবধারা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। মার্কসবাদ তাঁর কিশোর মনকে উদ্দীপ্ত করেছিল। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন প্রমুখের রচনা তিনি এই বয়সেই পড়তে শুরু করেছিলেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের লাইব্রেরি খুব সমৃদ্ধ ছিল। ছাত্রাবস্থায় এই লাইব্রেরি থেকে বিশ্বের নাট্যচর্চা ও নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেন। তাছাড়া দেশ-বিদেশের ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে এই সময় থেকেই তিনি গভীর ভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এছাড়া থিয়েটার এবং সিনেমা ও ফ্রপদী সংগীত নিয়েও তিনি চর্চা করেন। ফলে ইংরেজি তাঁর পাঠ্য বিষয় হলেও তাঁর নিরলস চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে সমগ্র মানবিকীবিদ্যা। কিন্তু তাঁর এই জ্ঞান তাঁকে যেমন বৈদগ্ধ্য দিয়েছে তেমনি তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় নাট্যচর্চাকেও ঋদ্ধ করেছে। তাঁকে কোনো গবেষক ‘থিয়েটার ওয়ালা’ উপাধি দিলেও তাঁর সহপাঠী বন্ধু, ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক পি.লাল তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন ‘Utpal was born brilliant’ একথা সর্বৈব সত্য। তাঁর নাট্যচর্চায় এজন্য অতি সহজে ঢুকে যায় বহু পঠনশীলতার পরিচয়, নাট্যপ্রয়োগে দেশ-বিদেশের কলাবিদ্যার ব্যবহার প্রায় সহজাত বৈশিষ্ট্যে যুক্ত হয়, আর প্রধানত বামপন্থী মতাদর্শ-মার্কসীয় দর্শন তাঁর নাট্যচিন্তাকে ভাব-গভীরতা এনে দেয়।

কলেজে পড়বার সময় তিনি শেক্সপিয়ারের নাটকগুলি খুব মন দিয়ে পড়ে ফেলেন— শেক্সপিয়ার-এর নাটকসংক্রান্ত অনেক বইপত্রও পড়েন। মূলত শেক্সপিয়ার পাঠ ও অভিনয় করার মাধ্যমে উৎপল দত্ত ক্রমশ শেক্সপিয়ারের নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। ফাদার উইভারের পরিচালনায় তিনি আরো দুটি নাটকের অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন— নিকোলাই গোগলের ‘ডায়মণ্ড কাটস ডায়মণ্ড’ এবং মলিয়ারের ‘দ্য রোগ উইয়েরিস অফ স্ক্যাপিন’। কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে তখন যে ধরণের নাটকের অভিনয় হচ্ছিল সেগুলিতে ছিল দর্শকদের মনে একটা বেদনার অনুভূতি সৃষ্টি করে নাটকের পাত্রপাত্রীর প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা। অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী এসব নাটকের মধ্যে দেখেছেন হতাশা বিপর্যয় এবং হেরে যাওয়া অসম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ প্রতিবাদী মানুষের কথা। এসব নাটকের মধ্যে মানুষের যে অসহায়তা ও হাহাকার তা তখনকার দর্শক দেখেছেন। কিন্তু এসব নাটকে ভাবীকালের সম্ভাবনা ছিল না। সেই নূতনকালের নাটকের আশ্বাদ পাওয়া গেল ‘নবান্ন’ নাটকে। উৎপল দত্ত ‘নবান্ন’ নাটক দেখে চমকে গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি তখনই বাংলা নাটকের জন্য প্রস্তুত হননি। তিনি নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের একটা ভাবনাকে চিনে নিয়ে নিজেকে নাটকের জন্য প্রস্তুত করছিলেন।

১৯৪৩ সালে উৎপল দত্ত চোদ্দ বছর বয়সে প্রথম নাট্যমঞ্চে অবিভূত হন। সেই বছর

কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে গণনাট্য সংঘ বা আই.পি.টি.এর জন্ম। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত সংঘর্ষপর্ব। সোভিয়েৎ বাহিনীর সঙ্গে ফ্যাসিবাদী যুদ্ধবাজদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে। ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর ভারতছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়েছে। ১৯৪৩-এর মধ্যভাগে বাংলাদেশের জনজীবন বিপর্যস্ত। ১৯৪৪-এ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ প্রযোজনা করে। ‘নবান্ন’ নাটককে কেন্দ্র করে একদল তরুণ ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পী একটি সংগঠনের তলায় একত্রিত হয়ে ছিলেন। উৎপল তখনো ছাত্র। কিন্তু নিয়মিত নাটক দেখছেন তিনি। ১৯৪৩-৪৫ সালের মধ্যে অনেক নাটক দেখেছেন। শিশির ভাদুড়ীর নাটকের বিশেষ ভক্ত ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে সেই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতেন। এবং তখনই তাঁর মনে হয়েছিল অভিনেতা ছাড়া তাঁর পক্ষে আর কিছু হবার জায়গা নেই। ১৩/১৪ বছর বয়সে যে কিশোরের এরকম উপলব্ধি হতে পারে তিনি যে কতটা চেতনার দিক থেকে অগ্রবর্তী তা সহজেই বোঝা যায়। ১৯৪৪ সালে ‘নবান্ন’ নাটকের অভিনয় দেখে তাঁর কী অনুভূতি হয়েছিল সেকথা তিনি পরে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন। ৪৪ বছর পরের এই সাক্ষাৎকারে তাঁর পরিণত চিন্তার কিছু ছাপ পড়েছে ধরে নিয়েও বলা যায় সে নাটক তাঁকে ‘চমকে’ দিয়েছিল। অথচ তাঁর প্রযোজনার মধ্যে কোনো চাকচিক্য ছিল না। ছিল তখনকার বাস্তব প্রতিবেশের রূপায়ণ। ‘নবান্ন’ নাটকের শুরু হত ৪২ এর আন্দোলনে পুলিশের গুলি চালনা দিয়ে। সমস্ত স্টেজ জুড়ে বহু মানুষের দৃশ্য— সেই দৃশ্য তাঁকে চমকে দিয়েছিল। এ থেকে দুটো জিনিস স্পষ্ট হয়। প্রথমত তিনি আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নাটককেই বেছে নিতে পেরেছিলেন। আর এই মাধ্যমকে তিনি পরে অন্যের চেতনা বিস্তারের কাজে প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয়ত সেই কৈশোর থেকেই তিনি এক তীব্র সমাজ সচেতন অনুভূতি লাভ করেছিলেন, যা তাঁকে সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তীকালে এই ভাবাদর্শ প্রকাশই তাঁর নাট্য রচনা ও অভিনয়ের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল।

১৯৪৭ সালের জুন মাসে কলেজের কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে উৎপল দত্ত কলেজের বাইরে গড়ে তুললেন তদানীন্তন কোলকাতার অন্যতম ইংরেজি নাট্য অভিনয়ের দল—‘দ্য অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস্’ যা উৎপলের নাট্যজীবনের প্রথম মাইল ফলক। পরে এবিষয়ে উৎপল দত্ত নিজেই বলেছেন—“সেন্ট জেভিয়ার্সে অভিনয়ের সময়েই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আমি থিয়েটারের লোক থিয়েটারেই থাকব। সারাজীবন থিয়েটার করব।”^৬ যে সকল বন্ধু তাঁকে এ নাট্যদল গঠনে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন — প্রতাপ রায় (তৎকালীন বিখ্যাত জমিদার সন্তোষ রায়ের ছেলে), নীলিম রঞ্জন দত্ত (উৎপলের ভাই), রজার লেসার, ফ্লোরেন্স জোসেফ, জেফ্রি

আইজাক, হার্ড ওয়ার্ডপোর্ট, এথেম মিনি এছাড়াও কয়েকজন ইহুদি মহিলা প্রমুখ।

১৯৪৭ সালের ৮ই অক্টোবর 'দ্য অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস্' নাট্যদলের প্রথম অভিনয় হয় সেন্ট জেভিয়ার্স হল-এ। এদিনের অভিনীত নাটক হল— 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' (তিনটি দৃশ্য) এবং 'ম্যাকবেথ' এর নির্বাচিত দুটি দৃশ্য। এ নাট্যদলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা 'রিচার্ড দ্য থার্ড' নাটকটি (২২ ডিসেম্বর ১৯৪৭)। এ নাটকেই উৎপল প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটকের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিজে এ নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এ নাটকের মহলা দেখে দ্য শেক্সপিরিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানীর জিওফ্রে কেণ্ডাল উৎপল দত্তকে তাঁর পেশাদার দলে অভিনয় শিল্পী রূপে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এ বছরেই উৎপল কেণ্ডালের দলে যোগদান করেন। এই প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত লিখেছেন যে, সেদিন জেফ্রি কেণ্ডালকে তিনি গুরু রূপে গ্রহণ করেন। 'দ্য অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস্' নাট্য দলের প্রযোজনায় ও উৎপল দত্তের পরিচালনায় পরবর্তী সময়ে ক্রমশ ইংরেজি ভাষায় শেক্সপিয়ারের বিভিন্ন নাটকগুলির অভিনয় হতে থাকে। 'ওথেলো' (৪ঠা জুলাই -১৯৪৮) 'এ মিড সামার নাইটস্ ড্রিম'(১৩ই অক্টোবর ১৯৪৮), 'টুয়েলফ্থ নাইট' (২২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯), 'মেরি ওয়াইভস অফ উইণ্ডসর,' 'জুলিয়াস সীজার'(১৫ই জুলাই ১৯৪৯)। এসব নাটক সেন্ট জেভিয়ার্স মধ্যেই অভিনীত হয়।

উৎপলের জীবনে জিওফ্রে কেণ্ডালের সংস্পর্শঃ ভারত ভ্রমণে আগত 'দ্য শেক্সপিরিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানী'-র পরিচালক জিওফ্রে কেণ্ডালের সংস্পর্শ উৎপলের নাট্যজীবনপথের এক নতুন মাইল ফলক। স্কুল জীবনে ফাদার উইভার -এর তত্ত্বাবধানে শেক্সপিয়ারের নাটকের অভিনয় এবং তরুণ বয়সে জিওফ্রে কেণ্ডালের নেতৃত্বে তাঁর দলের এক জন হয়ে অভিনয় করা উৎপল দত্তের নাট্যজীবনের প্রাথমিক পর্বে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়। এ দু'জন মহান নাট্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নাটক অভিনয় ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে তিনি যথার্থ দক্ষতা অর্জন করেন এবং নাটকের প্রতি তাঁর পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়।

কেণ্ডাল তাঁর নাট্যদল নিয়ে দুটি পর্বে ভারত সফরে আসেন। প্রথমবার ১৯৪৭-৪৮ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫৩-৫৪ সালে। উৎপল দত্ত তখন 'দ্য অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস্', দলের হয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স মধ্যে নাটক অভিনয় করেছিলেন। ঠিক এসময়ে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পেশাদারি নাট্যদল 'দ্য শেক্সপিরিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানী' কোলকাতায় আসে। এই নাট্যদলের পরিচালক জিওফ্রে কেণ্ডাল ও তাঁর স্ত্রী ল্যারা কেণ্ডাল। শেক্সপিয়ারের নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে দক্ষ এই দলের জগৎজোড়া সুখ্যাতি ছিল। আবার জিওফ্রে কেণ্ডাল শুধু প্রযোজক

হিসেবেই অভিজ্ঞ ছিলেন তাই নয়, পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবেও তাঁর তুলনা হয় না। সেন্ট জেভিয়ার্সের যে মঞ্চে উৎপল নাটক অভিনয় করছিলেন, কেণ্ডালের নাট্যদলের সে মঞ্চেই অভিনয় করার কথা। কিন্তু কেণ্ডাল তার দলের সঙ্গে যথেষ্ট অভিনেতা নিয়ে আসতে পারেননি। অথচ ভূমিকাবহুল নাটক প্রযোজনা করার ইচ্ছাও ছিল তাঁর প্রবল। তাই ২৭ অক্টোবর ১৯৪৭ তারিখে তাঁর দল যখন ‘ওথেলো’ নাটক প্রযোজনা করতে যায় সে সময় থেকে স্থানীয় শিল্পীদের নিয়োগ করতে হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, উৎপল দত্ত তখন সেন্ট জেভিয়ার্সে ইংরেজি নাটকের অভিনয় করেছেন। একটা বিষয় মনে রাখবার মতো যে, কলেজি অভিনয়ে তৃপ্ত থাকটা প্রতাপ এবং উৎপলের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তাই ১৯৪৭ সালের গোড়া থেকে তাঁরা কলেজের বাইরে নাট্যদল গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এটাই হচ্ছে লিটল থিয়েটার গ্রুপের গোড়া পত্তন। উৎপল দত্ত জানিয়েছিলেন — “ভুললে চলবে না লিটল থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজি দল হিসেবে এবং শেক্সপিয়ার নিয়ে তার যাত্রা শুরু। আমাদের প্রথম প্রযোজনা সেন্টজেভিয়ার্স মঞ্চ ভাড়া নিয়ে শেক্সপিয়ারের ‘তৃতীয় রিচার্ড’ নাটক ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ প্রথম অভিনয়।”^৯ এছাড়াও তিনি অন্য আরেক স্থানে জানিয়েছেন— “সেদিন চলতি ভাষায় আমার গুরু লাভ হয়।”^{১০} কারণ হিসেবে জানিয়েছেন যে, সেদিন এই নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন জিওফ্রে কেণ্ডাল ও তাঁর পরিবার। “ব্রিটিশ ভদ্রতা সর্বজনবিদিত সেজন্য তিনি আমাদের কোন গালাগাল দেননি নাটক দেখে। তবে তিনি আমাকে বললেন আমি ইচ্ছে করলে তাঁদের দলে যোগ দিতে পারি।”^{১১} তবে এসব তথ্যের যথার্থতা নিয়ে সৌমেন চট্টোপাধ্যায় ‘উৎপল দত্ত জীবনকথা’ নামক রচনায় উল্লেখ করেছেন— “এই কথাগুলোই এত বার ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর সাক্ষাৎকারে, স্মৃতি চারণায় যে উৎপলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জির বেশিরভাগ সংকলকই তথ্য যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করেন। অথচ সবই তো স্মৃতি থেকে বলা।”^{১২}

কলেজের বাইরে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নাট্যদল তৈরি করার মাধ্যমে এল.টি.জি-এর যে গোড়া পত্তন করতে চেয়েছিলেন তার গোড়াতেই জন্ম হয়েছিল ‘দ্য অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস্’ নাট্য দলটির। ক্রমশ এ দলের ‘কিউব’ এবং পরে এল.টি.জি -তে রূপান্তর ঘটে। ‘দ্য অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস্’ দলের প্রথম সম্পাদক শ্রী ই.এম পুনাওয়ালার এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, “The Group made its first debut on October 8, 1947.....Three scenes from'Romeo and Juliet' and two from 'Macbeth.’”^{১৩} এ তথ্য থেকে পরিস্কার যে ‘রিচার্ড দ্য থার্ড’ নাটকটির মাধ্যমে দলটির প্রথম আত্মপ্রকাশ হয়নি, হয়েছে ‘রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট’

ও ‘ম্যাকবেথ’ নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয়ের মাধ্যমেই, তাছাড়া তারিখটাও ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট নয়, ৮ই অক্টোবর। আরো একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, উৎপল দত্তের গুরু লাভের তারিখটাও ঠিক ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট নয়। কেননা কেণ্ডালের বিবৃতি থেকেই জানা যায় যে, সে সময়ে তিনি ভারতে এলেও কোলকাতায় ছিলেন না। ছিলেন শিলং-এ। “We were in Shillong in Assam in Independence day, 15 August 1947.”^{১৪} তাহলে একথা নিশ্চিত যে কেণ্ডাল উৎপলের দলের প্রথম প্রযোজনা দেখতে পাননি। তবে পুনাওয়ালার বিবৃতি অনুযায়ী জানা যায় যে, কেণ্ডালের দলের তিন জন উৎপলের দলের প্রথম প্রযোজনা দেখেছিল। “Three members of English touring group 'Shakespeareana', Viz. Miss Eileen Garner, Miss Jennifer Bragg and Mr Geoffrey Richards.”^{১৫} এই নাটক দেখে এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পুনাওয়ালার বলেছেন যে, —“When Interviewed after the show, Miss Garner said: A very good evening, full of colour and harmony and excellent acting.”^{১৬} ৮ই অক্টোবর ১৯৪৭ সালে উৎপলের দলের এই প্রথম প্রযোজনার সাফল্যের কথা কেণ্ডাল হয়তো তাঁর দলের ঐ তিন জনের মুখ থেকেই শুনে থাকবেন। এ বিষয়ে সৌমেন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন —“আমাদের অনুমান উৎপলদের প্রথম প্রযোজনা সু-অভিনীত হয়েছিল। ‘শেক্সপিওয়ানস’-এর দর্শক ত্রয়ীর মারফত জেফ্রি কেণ্ডাল সেটা শুনেছিলেন।”^{১৭} তাই ‘ওথেলো’ (২৩ অক্টোবর ১৯৪৭) নাটকের প্রযোজনা করতে গিয়ে যখন কেণ্ডাল স্থানীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়োগ করেন “তার আগে প্রশংসা শুনে এবং প্রয়োজনীয় স্থানীয় শিল্পী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে তিনি কাউকে কিছু না বলে উৎপলদের ‘রিচার্ড দ্য থার্ড’ নাটকের মহলা দেখেছিলেন। জহুরির চোখ ছিল কেণ্ডালের, মহলা দেখে জহুর চিনতে ভুল হয় নি তাঁর।”^{১৮} কিন্তু ‘রিচার্ড দ্য থার্ড’ নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৭ সাল।^{১৯} এসব তথ্যের ভিত্তিতে অনুমিত যে উৎপলের গুরুলাভ-এর ব্যাপারটা নিছক বানানো গল্প নয়, তার সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। তবে এই ‘গুরুলাভ’ ২২শে ডিসেম্বরে ‘রিচার্ড দ্য থার্ড’ নাটকের প্রথম প্রযোজনা দেখার পর নয়, কেননা, উৎপল তার আগেই কেণ্ডালদের দলে যোগ দিয়েছেন।^{২০}

যা হোক কেণ্ডালকে উৎপল কবে ঠিক গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন এবং কবে তিনি কেণ্ডালের দলে যোগ দিয়েছিলেন এ নিয়ে তথ্যগত কিছু বিভিন্মতা থাকলেও একটা বিষয় স্পষ্ট যে, উৎপল দত্ত কেণ্ডালের ভারত ভ্রমণের প্রথম পর্বে তাঁকে নাট্যজগতের গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন। উৎপলের জীবনে কেণ্ডাল পর্বের সুচনা হয়েছিল ‘দ্য অ্যামেচার শেক্সপিওয়ানস’ দলের প্রথম অভিনয়ের পর থেকেই। প্রথম পর্বে —“কোলকাতায় কেণ্ডালদের প্রথম অভিনয় ৯ই অক্টোবর

১৯৪৭ এবং শেষ অভিনয় ১০ই জানুয়ারী ১৯৪৮। এই চুরানবই দিন উৎপলের ভিতরকার দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছিল।”^{২১} তারপর কেণ্ডালের দল ভারত ছেড়ে অন্যত্র অভিনয় করতে গেলে উৎপল তাঁর নিজের নাট্যদল নিয়েই অভিনয় করতে থাকেন।

কেণ্ডালের ভারত ভ্রমণের প্রথম পর্যায়ে উৎপল দত্ত তাঁর দলের অভিনয় দেখেছেন, অভিনয় করেছেন এবং সে সঙ্গে নাট্যজগৎ সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতার বিস্তার ঘটিয়েছেন, নিজেকে বাস্তব সম্মত ভাবে সমৃদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। সারাদিন মহলা দিয়ে তারপর সন্ধ্যাবেলায় কীভাবে নাটক করা যায়, এ বিষয়ে তিনি বলেছেন —

“এখানেই শিখলাম, মেকাপ, কণ্ঠস্বরের উঠানামার কৌশল, দেহের ব্যায়াম, তলোয়ার খোলা। তার চেয়েও যা বেশি, এখানে এল মনোভাবের বিরাট পরিবর্তন, থিয়েটার ও নাটক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিটা গেল বদলে। ভাসা ভাসা স্বপ্নালুতা ঘুচে গেল। পেশাদার থিয়েটারের কঠোর বাস্তব সত্যগুলির সম্মুখীন হলাম।”^{২২}

কেণ্ডালের ধারাতেই উৎপল চিনতে পারলেন থিয়েটার ওয়ালা শেক্সপিয়ারকে।

ভারত ভ্রমণের প্রথম পর্বে কেণ্ডালের ‘শেক্সপিয়ারিয়ানা’ দলের দ্বারা কোলকাতায় অভিনীত নাটক সমূহের প্রতিটি নাটকই সেন্ট জেভিয়ার্স মঞ্চ, তখনকার লেট গ্যারিসন থিয়েটার-এ অভিনীত হয়েছিল।

কেণ্ডাল তাঁর দল নিয়ে দ্বিতীয় দফায় ১৯৫৩-৫৪ সালে এদেশে আসেন। উৎপল আবার এ দলে যোগ দেন মাদ্রাজে গিয়ে। এসময়ে উৎপল তাঁর দলে বাংলা নাটকই করেছিলেন। দ্বিতীয় পর্বে তিনি কেণ্ডাল ও তাঁর দলের সঙ্গে সমগ্র ভারত এবং পাকিস্তান সফর করেন। এবারেও উৎপল বেশ কিছু নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন।

কেণ্ডালের নাট্যদলের সঙ্গে অভিনয় এবং ভ্রমণের ফলে নাটক সম্পর্কে উৎপল অনেক কিছু শিখতে পারলেন। বুঝে নিতে পারলেন শেক্সপিয়ারের নাটক সম্বন্ধে। শিখলেন তাঁর নাটকের বিশ্লেষণ করতে। আর এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি শিখলেন নাট্য প্রয়োগের গভীরতা কতখানি হতে পারে। তাছাড়া তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন, নাট্যপ্রয়োজনায় পেশাদারী দক্ষতার প্রয়োজনের কারণ কী? “এই থিয়েটার দলের সঙ্গে অভিনয় করে তিনি শিক্ষিত ও দীক্ষিত হয়েছিলেন থিয়েটারের শৃঙ্খলায়, তার নিয়মানুবর্তিতায়। ধীরে ধীরে একজন নাট্য প্রযোজক হিসেবে গড়ে উঠেছেন উৎপল দত্ত।”^{২৩} তিনি কেণ্ডালের কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণ, বাক্ভঙ্গি, বচনের তীব্রতার দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেণ্ডালের মাধ্যমেই তিনি শেক্সপিয়ারকে যথার্থ ভাবে বিশ্লেষণ করতে শিখলেন। তাই পরবর্তীতে তিনি ‘শেক্সপিয়ারের সমাজচেতনা’ (১৯৭৩) নামক গ্রন্থ রচনা করে

তাঁর নাট্যগুরু জিওফ্রে কেণ্ডালের প্রতি তা উৎসর্গ করেন এবং উৎসর্গপত্রে উৎপল তাঁর নাট্য কর্মশিক্ষার অনুকৃত্য হিসেবে লিখেছেন—

"Dear Geoff,

Pleas permit me to dedicate this book to you. I can not help it beacuse you taught me what little I know of Sheakespeare and have left me no other way of paying old debts."^{২৪}

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন উৎপল দত্ত। ‘Three Bengali Novelists’ নামের সেই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, নতুন প্রজন্মের ‘কাব্যলক্ষ্মী হলেন শ, লরেন্স, জয়েস এবং হাক্সলি’, ‘তাদের দুর্গ স্থালিনগ্রাদ এবং ম্যাঞ্চেস্টার আর ডাস ক্যাপিটাল তাদের নতুন বেদ। আঠারো বছরের উৎপল তখনই যুগের ধর্মকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সাহিত্যে আঙ্গিকের চেয়ে বস্তুর গুরুত্ব, তথ্যের গুরুত্ব যে নতুন যুগের ধর্ম তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সাহিত্যে যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটছে তা অত্যন্ত সঙ্গত বলে তাঁর মনে হয়েছিল, আর তার মূলে ছিল শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শ, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের শিকল ছিঁড়ে দাঁড়াবার প্রেরণা। ১৯৪৭ সালে লেখা এই প্রবন্ধে উৎপলের সময়চেতনা এবং যুগবৈশিষ্ট্যের জ্ঞান অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। উৎপল নিজে ছিলেন স্বচ্ছল এবং অভিজাত পরিবারের মানুষ। কিন্তু অনেক কম বয়সেই রাজনীতির জ্ঞান তাঁকে এই চেতনায় ঋদ্ধ করে তুলেছিল।

সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র থাকার সময় থেকেই শেক্সপিয়ারের নাট্য অভিনয়ের সুযোগ হয়েছিল তাঁর। এরপর শেক্সপিয়ারের নাটক অভিনয়ের মধ্যদিয়েই তাঁর নাট্য জীবনের প্রকৃত সূচনা ঘটে। কুমার রায় তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন ‘শেক্সপিয়ারই ছিল তাঁর প্রেরণা।’ আর ছাত্রজীবন থেকে শেক্সপিয়ার চর্চা, জেফ্রি কেণ্ডালের কাছে শেক্সপিয়ার অভিনয়ে এবং সাধারণ ভাবে পেশাদারী অভিনয়ে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ এ সবই তাঁর নাট্য প্রস্তুতির পর্ব বিশেষ। শুধু নাট্য প্রস্তুতিই নয় উৎপল দত্ত নিজে বলে গিয়েছেন কেণ্ডালের শিক্ষায় বিশ্ব রাজনীতি, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর বোধ গভীর হয়। আর সব কিছুকে “থিয়েটারের প্রয়োজনে সুসংবদ্ধ ও আয়ত্ত্ব করে নেওয়ার”^{২৫} দক্ষতাও তাঁদের সংস্পর্শেই ঘটে। তাছাড়া ছিল শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মনিষ্ঠার শিক্ষা। কেণ্ডাল বলতেন There is no art without discipline and no discipline without sacrifice. সুতরাং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে যে নাটক অভিনয়ে তাঁর পথচলা শুরু হয়েছিল জেফ্রি কেণ্ডালের দলের শিক্ষায় তাকে তিনি পেশাদারী দক্ষতায় রূপান্তরিত করতে শিখলেন।

সেন্ট জেভিয়ার্স পর্যায়ে অন্তত তেরোটি নাটকে তিনি অভিনয় করেন। ফাদার উইভার, কেণ্ডাল, ফাদার ফিৎজেরাল্ড এ তিনজন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাসহ উৎপল নিজে আটটি নাটক পরিচালনা করেছেন। উপরের আলোচনা থেকে এও জানা যায় যে, উৎপলের অভিনীত অথবা পরিচালিত নাটকের নাট্যকারদের মধ্যে শেক্সপিয়ার ছাড়াও গোগোল, মলিয়ের বার্নার্ডশ, গোল্ড স্মিথ এবং প্যাট্রিক হ্যামিণ্টন এঁরাও ছিলেন।

ভবিষ্যতে যিনি নিজেকে প্রোপাগান্ডিস্ট বলে দাবি করবেন, যিনি জীবনভর ‘নাটকের মতো ইশতেহার আবার ইশতেহারের মতো নাটক’ লিখবেন ও অভিনয় করে যেতে থাকবেন, সেন্ট জেভিয়ার্স হল তাঁর আত্মপ্রকাশের উদ্যোগ পর্ব। নিপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি থেকে নিপীড়কের প্রতি ঘৃণা, ঘৃণা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে প্রতিজ্ঞায় উত্তরণের প্রথম সোপান হল এই সেন্ট জেভিয়ার্স।

কিউব ও এল.টি.জি পর্যায় : ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দ - উৎপলের কলেজ জীবনের এ চারটি বছরে বাংলা তথা ভারতবর্ষের পরিস্থিতি ছিল ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশ ভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর- এসব ঘটনা সমূহকে এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়নি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের। তার প্রভাব এসে পড়েছিল কলেজের উপর। তাই মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষকে কলেজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। সে কারণে নাটক অভিনয়ের পরিমাণও কমে গিয়েছিল। তবুও সময় বার করে সুযোগ সাধ্য মতো উৎপল দত্ত তাঁর অভিনয় চালিয়ে গেছেন। সে সময়ের এই রাজনৈতিক অস্থিরতার কালকে অন্যান্য সৃজনশীল শিল্পীর মতোই অস্বীকার করতে পারেননি উৎপল দত্ত। দেশের স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরে পরেই অশিক্ষা-অস্বাস্থ্য-রুগ্ন কৃষি, শিল্পের ঘাটতি তথা ভগ্নপ্রায় অর্থনীতি ইত্যাদি নানা জটিল সমস্যায় আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত এক ভারতবর্ষ উৎপলের চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠল।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হল। সারা দেশের কমিউনিস্ট নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হল। গণনাট্য সংঘের নাট্যকর্মীদের ওপর নানাদিক থেকে আক্রমণ নেমে এল। তেভাগা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহু কৃষক মৃত্যুবরণ করে, অনেকে গ্রেপ্তার হয়। কমিউনিস্ট পার্টি এই সময় সশস্ত্র বিপ্লবের শ্লোগান দেয়। তারা এই স্বাধীনতাকে বুটা আজাদী বলে অভিহিত করে। কারণ “স্বাধীনতা বলতে তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে বেশি কিছু বুঝত। বুঝত সাধারণ মানুষের সর্বাত্মক মুক্তি।”^{১৬} ১৯৩৫ সাল থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি সেই আন্দোলনে মানবতার পক্ষে

মানব সভ্যতার রক্ষার প্রশ্নে এদেশের প্রগতিশীল মানুষদের এক মঞ্চে সংগঠিত করেছিল। উৎপল দত্তের বয়স সেই আন্দোলনে যোগ দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু তিনি সেই অল্প বয়সেই কমিউনিস্টদের পক্ষে যে তার সমর্থন তা বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৭৭ সালে এপিক থিয়েটার পত্রিকায় এক স্মৃতিচারণে তিনি লিখেছেন— “স্কুলে থাকতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাল ফৌজের মহান প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমণের কাহিনী পড়ে চমকিত হতাম। স্তালিনের সহজ ও তীক্ষ্ণ ভাষায় লেখা নামফ্লেট ও বই তখন থেকে পড়েছি।”^{২৭} স্কুলে থাকতেই সোভিয়েত লালফৌজের প্রতিরোধের কাহিনী তাকে আলোড়িত করেছিল। পরে যখন এদেশে প্রগতি লেখক সংঘ ও ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হল তখন তার আঁচ তাঁকে স্পর্শ করে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ‘নবান্ন’ প্রযোজনা তাকে যেমন অভিভূত করেছিল তেমনি তাঁর নিজের প্রতিবাদী চেতনাও তাঁকে পুষ্ট হয়েছিল। সারা পৃথিবী ব্যাপী প্রগতি লেখকদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাতে বহু খ্যাতনামা লেখক শিল্পী যোগ দিয়েছিলেন— তার মধ্যে একটা মূল কথা প্রকাশ পেয়েছিল—“শুধু বাস্তববাদী হলেই চলবে না বাস্তবের মোকাবিলা করতে হবে যোদ্ধা হিসেবে।”^{২৮} পলরোবসন বেতারবার্তা পাঠিয়ে বললেন— ‘Every antist every scientist must decide now where he stands।’^{২৯} প্রগতি সাহিত্যের যে সংজ্ঞা তখন তার ইশতেহারে দেওয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল সাহিত্যকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পিছিয়ে পড়া মানুষের সমস্যা এবং রাজনৈতিক... subjugation-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। সারা পৃথিবীর প্রগতিচেতন লেখক শিল্পীদের এই মনোভাবের সঙ্গে এদেশের শিল্পীরাও একাত্মবোধ করেছিলেন। আগেই বলেছি উৎপল দত্ত কম বয়সেই রাজনৈতিক দিক থেকে অনেকটা প্রাগ্রসর চিন্তা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর জীবনকথা থেকে জানা যায় “সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে নানা পন্থায় বিশ্বাসী ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক।”^{৩০} এই পরিস্থিতিতে যখন এদেশে কমিউনিস্টদের উপর নির্যাতন চলছে তখন উৎপলও স্থির থাকতে পারেননি। একটি পরিসংখ্যান অনুসারে দেখা যায় ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সারা দেশে জেলবন্দী মানুষের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার আর বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি। সেই সময় কমিউনিস্টদের আন্দোলনে কলকাতা উদ্বেলিত। কারাগারগুলিতে বন্দীদের উপর গুলি চলেছে, মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ হয়েছে। তার ক’বছর আগেই এদেশে মহামঘস্তরে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। সে স্মৃতি এখনো উজ্জ্বল। দেশবিভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তদের বিক্ষোভ, শ্রমিক সমাবেশে গুলি চালনা এসব তখনকার বাংলার জলন্ত বাস্তব চিত্র। এই প্রেক্ষিতে উৎপল আবার যোগ দিলেন তাঁর ‘অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস্’ (১৯৪৮)-এ। এই পর্বেও তাঁরা শেক্সপিয়ারের নাটক

অভিনয় করে চলেছেন। ১৯৪৮ এর জানুয়ারি থেকে ‘জুলিয়াস সীজার’, ‘মিডসামার নাইটস ড্রিম’, ‘রোমিও জুলিয়েট’, ‘টুয়েলফথ্ নাইট’ অভিনীত হয়েছে। ইংরেজি নাটকের এই অভিনয় সম্পর্কে উৎপল দত্তের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় পরবর্তীকালে লেখা একটি প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন—

“১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি হল। গ্রেপ্তার নির্যাতন গুণ্ডামি চলল বেপরোয়া। আর লিটল থিয়েটারের নিশ্চিত নাট্য সাধনাকে ক্রমশঃ মনে হতে লাগল হাস্যকর, অকিঞ্চিৎকর এক ভণ্ডামি।”^{৩৩} এই হতাশা থেকে একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি হল। ১৯৪৯ এর মার্চ-এ ‘রোমিও জুলিয়েট’ নাটকের প্রোগ্রামে একটা “রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক”^{৩৪} প্রবন্ধ ছেপে দিলেন। প্রবন্ধের শুরু স্তানিলাভস্কিকে লেখা গোর্কির পত্র উদ্ধৃত করে, আর শেষ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কণ্ঠরোধের প্রতিবাদে। ‘রোমিও জুলিয়েট’ নাটকের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হল। এরপর ‘জুলিয়াস সীজার’ নাটকের প্রযোজনার মধ্যে তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ‘জুলিয়াস সীজার’ নাটকের ভূমিকা তৈরি হয়েছিল রোমিও জুলিয়েটের নবভাষ্যে যা অভিনয়পত্রীতে ছাপা হয়েছিল। আর তার সূত্র ছিল দেশের পরিস্থিতির মধ্যে। সৌমেন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে তার বর্ণনা দিচ্ছিঃ “১৯৪৯ এর মার্চ মাসে রেল ধর্মঘট উপলক্ষে ব্যাপক ধর পাকড় চলছিল। এপ্রিল মাসে বৌবাজারে নারী মিছিলে আর জুন মাসে দমদম জেলে গুলি চালিয়েছে পুলিশ। পটারি আর অ্যালেনবেরিতে শ্রমিকদের লড়াই চলছে।”^{৩৫} এই পরিস্থিতিতে তিনি ‘জুলিয়াস সীজার’ প্রযোজনা করলেন। ‘জুলিয়াস সীজার’ নাটক উপস্থাপিত করা হল আধুনিক পোষাকে। “আধুনিক বলতে ফ্যাসিস্ট ইটালিয় উর্দিতে... শেক্সপিয়ারের একটি অক্ষর পরিবর্তন না করেও একটি অত্যাধুনিক রাজনৈতিক নাটক হয়ে উঠেছিল সিজার।”^{৩৬} সেই নাটকের উপস্থাপনা ১৫.৭.১৯৪৯ তারিখে। উৎপল অভিনয় করলেন মার্কাস ব্রুটাস চরিত্রে। “আধুনিক পোষাকে চরিত্রদের উপস্থিত করলেন এবং ফ্যাসিস্ট শক্তি রোমান যুগ থেকে এখনো প্রবহমান”^{৩৭} নাটকটির সেরকম ব্যাখ্যা দিলেন। উৎপল দত্তের কথায় সেই ব্যাখ্যা এরকম—

“আমাদের সিজার ফেণ্টহ্যাট মাথায় যখন ভাষণ দিতে উঠলেন, সমবেত কালো ও লাল পোশাকে সজ্জিত সেনেটরগণ যখন প্রবল ‘হেইল’ উচ্চারণে হাত তুলে সেলাম করলেন, যখন প্রজাতন্ত্রী ব্রুটাস রক্তপাতের মুখোমুখি হয়ে দোদুল্যমান, যখন উগ্রপন্থী ক্যাসিয়াস নির্ভুলভাবে রক্তাক্ত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বোঝান, যখন নির্মম কুচক্রী এ্যান্টনি যে কোনো মহাবাগমী ফ্যাসিস্টের মতন জনতাকে বিপথে চালিত করেন, তখন নাটক হঠাৎ হয়ে উঠেছিল সমকালীন বিশ্বের এক দর্পণ।”^{৩৮}

প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই পোষাকের পরিবর্তন ছাড়াও আরও বৈচিত্র্য ছিল। “ব্রুটাস ও এ্যান্টনির

ফোরাম বক্তৃতা দুটি আমরা উপস্থিত করেছিলাম রেডিও ভাষণ হিসেবে। শেষ ফিলিপাই যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়ে ছিলাম বোমা বিধ্বস্ত এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ... ঘন ঘন মেশিন গান ও উড়ন্ত বোমারু বিমানের আবহশব্দের সঙ্গে চলছিল শেষ অঙ্কের অভিনয়।”^{৩৭} আধুনিক পোষাকে ‘জুলিয়াস সীজার’ নাটকের উপস্থাপনা সকলের পছন্দ হয়নি। কিন্তু ‘দি স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় নাটকটি প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য এবং তার ‘Ingenious features’ এর প্রশংসা করা হয়েছিল।^{৩৮} আধুনিক পোষাকে ‘জুলিয়াস সীজার’ প্রযোজনার ইতিহাসে একটা ‘দিক চিহ্ন’ বিশেষ। এরপর ‘অ্যামেচার শেক্সপিয়ারিয়ানস্’ - শেক্সপিয়ারের ‘টুয়েলফথ্ নাইট’ উপস্থাপনা করে।

সৌমেন চট্টোপাধ্যায় অনেক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এল.টি.জির প্রতিষ্ঠা ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে। “আমাদের ধারণা লিটল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪৯ এর শেষ দিকে।”^{৩৯} ‘টুয়েলফথ্ নাইট’ অভিনয়ের পর অ্যামেচার শেক্সপিয়ারিয়ানস্ নাম বদল করে প্রথমে রাখা হয়েছিল ‘কিউব’। যাঁরা লিটল থিয়েটার গ্রুপের ইতিহাস চর্চা করেছেন তাঁরা দেখিয়েছেন কিউব এর নামে একটি মাত্র নাটক জেমস প্যারিশের ‘ডিস্টিংগুইশড গ্যাদারিং’ অভিনীত হয়েছিল ১৯৪৯ এর নভেম্বরে। আর এ থেকে বোঝা যায় ১৯৪৯ সালের ৬ নভেম্বর পর্যন্ত নাট্যদলের নাম ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’ হয়নি। আর ‘কিউব’ দলের নামে দ্বিতীয় কোনো নাটক অভিনয়ের কথাও জানা যায় না। ১৯৫০-এ ‘ওয়েটিং ফর লেফটি’ অভিনীত হয়েছিল ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপে’র নামে। নামটি দিয়েছিলেন ‘দিলীপ রায়’। “দিলীপ রায়ের নাম প্রথম পাওয়া যায় ‘কিউব’ দলের ‘ডিস্টিংগুইশড গ্যাদারিং’ নাট্য প্রযোজনার সংগঠক হিসেবে।”^{৪০} দিলীপ রায়ের প্রস্তাবে দলের নূতন নাম হয়। এতদিন পর্যন্ত এঁরা শেক্সপিয়ারের নাটকই প্রধানত অভিনয় করে চলেছিলেন। কিন্তু দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে নিজেদের সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে উৎপল নিজেই প্রশ্ন মনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

“শেক্সপিয়ারে বা বার্নার্ড শ-এ আটকে থাকাই তখন অসহ্য লাগছিল। কারাগারে গুলি চালনার সংবাদে ক্রোধ যেন ব্যর্থ নিঃশ্বাস হয়ে ধাক্কা মারছিল বক্ষপঞ্জরে। কাকদ্বীপে নারীহত্যা নয়ানপুরের মাটি লাল, ডিব্রুগড়ে গণনাট্যের অনুষ্ঠানে গুলিবর্ষণ ময়দানে-হাজরা পার্কে জন-সমাবেশে বেপরোয়া গুলিচালনা, বউবাজারে নারী মিছিলের ওপর গুলি-আর লিটল থিয়েটার কিসের তপস্যায় মৌনী?”^{৪১}

এই দায়বোধ থেকে ক্লিফোর্ড অডেটস এর ‘ওয়েটিং ফর লেফটি’ নাটক মঞ্চস্থ করা হল। ‘ওয়েটিং ফর লেফটি’ ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপে’র প্রথম নাটক। ‘লিটল থিয়েটার’ নামটি নিশ্চয় এঁরা খুব চিন্তা করেই নির্বাচন করেছিলেন। নামটি নেওয়ার কারণ হিসেবে দলের এক প্রতিবেদনে বলা

হয়েছিল সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় হয়ে এঁরা থাকতে চাননি। এঁদের নাট্য প্রচেষ্টা মোটেই সখের ব্যাপার ছিল না। কোনো আমুদে সাক্ষ্য মিলনের বিষয়ও এটা নয়। “এটা রীতিমত কায়িক শ্রম ও আন্তরিক নিষ্ঠার”^{৪২} জিনিস। কাজেই বোঝা যায় দলের নামটি এঁরা বেশ ভাবনাচিন্তা করেই নিয়েছিলেন। লিটল থিয়েটার নামের দ্বারা এঁরা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক থিয়েটার ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

“১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই লিটল থিয়েটার আন্দোলন ইউরোপে শুরু হয়েছিল। ... প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের নানাস্থানে এই লিটল থিয়েটার ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। প্রতিষ্ঠানিক থিয়েটারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপই এগুলির প্রচেষ্টা কার্যকরী হতে থাকে। মার্কসবাদী মতাদর্শে এগুলি মূলত পরিচালিত হত। ... শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের দায়িত্বেই এই থিয়েটারের বিস্তার ও প্রসার ঘটেছিল।”^{৪৩}

উৎপল দত্ত এবং তাঁর লিটল থিয়েটার এই মতাদর্শকেই গ্রহণ করেছিল। কাজেই একদিকে সমাজতন্ত্রী মতাদর্শ গ্রহণ ও বিশ্ব রাজনীতির সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার চেষ্টা আর শেক্সপিয়ারের সীমাবদ্ধ আয়তন ছেড়ে রাজনৈতিক নাটক অভিনয়ের দ্বারা সেই মতাদর্শকে জনমনে সঞ্চার করবার দুটি ভূমিকা এই নাট্যদল গ্রহণ করে। ক্লিফোর্ড অডেটস এর ‘ওয়েটিং ফর লেফটি’ অভিনয় করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। উৎপল দত্ত লিখেছেন “মহলায় বিঘ্ন ঘটিয়েছিল একদল মস্তান আর অভিনয়ের দিন মঞ্চার আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল।”^{৪৪} তবু এঁরা হতাশ হননি। এদের যে মতাদর্শ গ্রহণ এবং প্রচার লক্ষ্য ছিল তার কথা উৎপল দত্ত পরে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন। “আমাদের গ্রুপ এর মধ্যেই আসছিল বামপন্থী ধ্যানধারণা, ভাবনা। কেননা স্মরণ রাখতে হবে আমাদের অন্য সদস্যরা বেশির ভাগই ছিলেন Jewish। ... সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম করেছিলেন তখন ইহুদীরা। এবং ভারতে তখন প্রচণ্ডভাবে বামপন্থী ধ্যান ধারণার প্রবাহ।”^{৪৫}

এই মতাদর্শগত কারণে এরপর যে নাটক এঁরা অভিনয় করেন তা হল ‘টিল দি ডে আই ডাই’। এটিও অডেটস এর নাটক। এটি জার্মানির ভারতীয় কমিউনিস্টদের আত্মবলির কাহিনি হয়ে উঠেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যাবার পর তার সদস্যদের আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে এই নাটকটি লেখা। উৎপল দত্ত নিজে লিখেছেন জার্মান পার্টির বীরত্ব গাথা। ৪৯ এর কলকাতায় ‘ওয়েটিং ফর লেফটি’ অভিনয় করতে গিয়ে তিনি যে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাতে তাঁর এই উপলব্ধি হয়েছিল যে “কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে কোনো সংস্কৃতিই টিকে থাকতে পারে না।”^{৪৬} কাজেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লেখা নাটক অভিনয় করলেন। তাকে বাংলার কমিউনিস্টদের সমস্যার নাটক করে তুললেও কিন্তু

শেক্সপিয়ার বা ক্লাসিকের অভিনয় ছেড়ে এরা তখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি। এরপর শেক্সপিয়ারের নাটক এবং বাগার্ডশ'র নাটক এল.টি.জি. অভিনয় করে গেছে। তার একটা কারণ সম্ভবত নাট্যদলে জিউস অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রাধান্য। দ্বিতীয় কারণ আবালা ইংরেজি নাট্য এবং সাহিত্য চর্চা। তৃতীয় কারণ অভিনয় যোগ্য বাংলা নাটকের অভাব। ইতিমধ্যে উৎপল দত্ত কিছুদিন গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে অভিনয় এবং নাট্য পরিচালনা করলেন। এর আগে ১৯৫০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার পর স্পার্টা ময়দানে যে বিজয়োৎসব হয় তাতে এঁরা 'টিল দি ডে আই ডাই' নাটকটি অভিনয় করেন। ১৯৫১ সালে তিনি গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে বাংলায় নাটক অভিনয় এবং বাংলা নাট্য পরিচালনা করলেন। গণনাট্য সংঘে তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' পরিচালনা করেন। গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে এতদিনকার মুষ্টিমেয় ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীর দর্শকদের ছাড়িয়ে তিনি বহু মানুষের কাছে নাটককে নিয়ে যেতে পারলেন। গণনাট্য সংঘ তাঁকে জনতার মুখরিত সখে নিয়ে গেল। বাইরে থেকেও বাংলা নাটকের চাহিদা দেখা দিচ্ছিল। 'পরিচয়' পত্রিকায় সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, এদের 'খেটে খাওয়া সাধারণ বাঙালির' দৈনন্দিন জীবন নিয়েও নাটক করতে হবে। সরোজ দত্ত লিখলেন 'মেহনতী মানুষের' জীবন নিয়ে নাটক না করলে এরা সফল হবেন না।

এল.টি.জি -র বাংলা শাখা ৪ লিটল থিয়েটার (গ্রুপের) প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪৯-এর শেষের দিকে, এবং ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে তাদের প্রথম প্রযোজনার সম্ভাবনাই বেশি। তবে এখন অবধি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, 'দি অ্যামেচার শেক্সপিয়রিয়ানস্' নাট্যদল 'কিউব' নাম নিয়ে অভিনয় করার পরে ১৯৪৯ এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' নামে প্রতিষ্ঠা পায় এবং ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে ঐ নামে অভিনয় করে। ক্রমশ দুটি পর্যায়ে এই অভিনয় হয়। প্রথম পর্যায় ইংরেজি শাখা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলা শাখা।

উৎপল দত্তের নাটকের কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল এমন একটা সময়ে যে সময়কে ঝড়ের যুগ বলা যায়। ইংরেজি নাটক বিশেষত শেক্সপিয়ারের নাটক চর্চায় আত্মনিয়োগ করার বাসনা তাঁর দীর্ঘদিনের। তাই তাঁর দল ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে এত বেশি সংখ্যক ও এত ভারী ইংরেজি প্রযোজনা করেছিল যে, বাংলায় আর কোন নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তবুও ভবিষ্যৎ হিসেবে শেষ পর্যন্ত উৎপল দত্তকে বাংলা থিয়েটারে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। যুগের উত্তাল সময়ে তিনি ইতিহাসের ডাককে এড়িয়ে চলতে পারেন নি। তাঁর সাহিত্যবোধ তাঁকে শিথিয়েছিল মানুষকে ভাল বাসতে। আর সেই চেতনাই তাঁর মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিল নিজের

দেশের বৃহত্তর সমাজের জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার দিকে। তারই ফল স্বরূপ দেখা যায় ‘দ্য অ্যামেচার শেক্সপিరిয়ানস্’ পর্যায়ের ‘রোমিও জুলিয়েট’ প্রযোজনা থেকেই উৎপলের থিয়েটারে মার্কসবাদী চিন্তা অঙ্কুরিত হচ্ছিল। কিন্তু এই অভিনয় যদি ভারতের মাটিতে ইংরেজি ভাষাতে চলত, তবে তার ক্ষেত্র ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত। কেননা ইংরেজি ভাষায় নাটক দেখার দর্শক এদেশে তেমন ছিল না। এ বিষয়ে উৎপল দত্ত নিজেই বলেছেন —

“একটা বিরাট সেকশন ছিল আমাদের থিয়েটারে, যাঁরা ইংরেজ ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলা।In fact তাঁদের পয়সাতেই এই সব নাটকগুলি চলত। না হলে চলার কোন কথাই নয়। তিনটে চারটে শো তো হত। পাঁচটা ম্যাকসিমাম। এরা ছাড়া কিছু ইঙ্গ-ব্যঙ্গ। যারা ইংরেজ যেখানে যাচ্ছে সেখানে না গেলে তাঁদের তো মান থাকে না ... সেই জন্য আসতো তো আমরা বুঝতে পারছিলাম, এভাবে চলতে পারে না। তাই আমরা চিন্তা করতে শুরু করেছিলাম, ... বাংলায়, কদিনে বাংলা শুরু করব।”^{৪৭}

তাছাড়া লিটল থিয়েটারের সদস্যরাও জানান —

“১৯৪৯-এর শেষ পর্যন্ত পর পর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও আমরা কোলকাতায় শেক্সপিয়ার প্রচারের হাস্যকর প্রয়াস পেতে লাগলাম। ১৯৫০ পড়তে ইংরেজিতে অভিনয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলেও হতাশা আসেনি। কিন্তু দর্শক সংখ্যা দিনের পর দিন কমে আসতে লাগল। আর্থিক ক্ষতি স্বীকারের একটা সীমা আছে - বিশেষ করে আমাদের মতন দরিদ্র দলের পক্ষে। ‘মেরি ওয়াইভস্ অফ উইগুসর’, ‘ওথেলো’ এবং ‘আর্মস অ্যাণ্ড দ্য ম্যান’ করে নিজের নাক কেটে নিজে যাত্রাভঙ্গ করা আমরা শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিলাম।”^{৪৮}

কিন্তু বাংলা থিয়েটার করা সহজ কাজ নয়। যোগ্য অভিনেতা অভিনেত্রী, উপযুক্ত নাটক এসবের বড় অভাব। অবশেষে একটা সুযোগ উপস্থিত হয়। ১৯৪৯ সালের ১৫ ই জুলাই তারিখে ‘সেন্ট জেভিয়ার্স’ হল- এ ‘জুলিয়াস সীজার’ নাটকের অভিনয় দেখে ‘নিউ রিপাবলিক’ পত্রিকার নাট্য সমালোচক রনেন রায় কফি হাউসের আড্ডায় রবি সেনগুপ্তকে সেই নাটক ও তাঁর প্রতিভাবান পরিচালকের কথা জানান। এই সমলোচনা সূত্রেই উৎপলের সঙ্গে রনেন রায়ের আলাপ হয় এবং তাঁরা উৎপলের দলে যোগ দিলেন। গণনাট্য সংঘ থেকে ফিরে এসে উৎপল বাংলায় অভিনয়ের কথা ভাবছিলেন। উৎপল নিজে লিখেছেন “গণনাট্য সংঘ যে আদর্শে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল সে আদর্শকে আঁকড়ে ধরার বাসনা আমাদের প্রায় সবাইকে পেয়ে বসেছিল। নাটক হবে বাংলায়, নাটক হবে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জন্য, নাটক কইবে সংগ্রামের কথা।”^{৪৯} অবাঙালি সদস্যরাও

সে প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। এর আগেই অবশ্য লিটল থিয়েটার একটি বাংলা নাটকের অভিনয় করে। রবি সেনগুপ্তের সঙ্গে জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের যোগ ছিল। রংপুরের কমরেডরা তাঁকে অনুরোধ করেন, একটা নাটক করে কিছু টাকা সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য। সে প্রস্তাব রবি সেনগুপ্তের মাধ্যমে উৎপল দত্ত গ্রহণ করেছিলেন। তখনো বাংলা নাটকের জন্য দলের সকলের মন স্থির হয়নি, তাই সদস্যদের মত সর্বসম্মত না হলেও সভাপতির কাস্টিং ভোটে এল.টি. জি এর বাংলা শাখা খোলার প্রস্তাব পাশ হল। রবি সেনগুপ্ত হলেন এল.টি.জি এর বাংলা শাখার প্রথম সম্পাদক। এই বাংলা শাখার নাম হল ‘সংস্কৃতি সংঘ’। পরে এই বাংলা শাখার পরিবর্তিত নাম হয় ‘নবমঞ্চ’ ২৭ অক্টোবর ১৯৫১ সাল থেকে।

এল.টি.জি-র বাংলা শাখার প্রথম প্রযোজনা শিউলি মজুমদারের ‘গোস্টস্’ (ইবসেনের অনুবাদ) নাটক। ২৬ শে নভেম্বর ১৯৫০ সালে নাটকটি অভিনীত হয় নিউ গ্র্যান্ডপ্যায়ারে। উৎপল দত্ত এই নাটকে ‘ম্যাগাস’ চরিত্রে অভিনয় করেন। এ নাটকে অনেক বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করেন। সে সময় সমালোচকেরা এ নাটকের অভিনয় সম্পর্কে ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় লিখেছিলেন —“The General Level was so good that it is difficult to allot individual praise”^{৫০}

ইবসেনের ‘দ্য ডলস্ হাউস’ এর বাংলা রূপান্তর ‘পুতুলের সংসার’ এল.টি.জি-র দ্বিতীয় প্রযোজনা। ১৯৫১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ‘শ্রীরঙ্গম’ মঞ্চে নাটকটি অভিনীত হয়। এ নাটকে উৎপল দত্ত ‘টরভালড’ (টলিভালড?) চরিত্রে অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে উৎপল দত্তের কিছু মুদ্রাদোষ লক্ষিত হয় বলে ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকায় মত ব্যক্ত করেছেন গোপাল হালদার। এ নাটকটির বাংলা অনুবাদ করেন দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

এল.টি.জি.-র বাংলা শাখার সবচেয়ে ভালো প্রযোজনা ‘সাংবাদিক’ নাটকটি। উৎপল দত্ত লিখেছেন— “লিটল থিয়েটার পুরোপুরি বাংলা দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সাংবাদিক নাটক নিয়ে।”^{৫১} রুশ নাট্যকার কনস্তানতিন সিমনভের লেখা নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ ‘দ্য রাশিয়ান কোয়েশচন’ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন সরোজ দত্ত। ১৯৫২ সালের ৬ ই ডিসেম্বরে প্রথম অভিনয় আই.টি.এফ. প্যাভিলিয়ান মঞ্চে। পরিচালকের ভূমিকায় ছিলেন উৎপল দত্ত। এ নাটকে ‘হারি স্মিথ’ চরিত্রে অভিনয়ও করেন তিনি। এ অভিনয় হয়েছিল উঁচু মানের এবং সাফল্য মণ্ডিত। নাটকটির অভিনয় প্রসঙ্গে মৃগাল সেন ‘ইউনিটি’ পত্রিকায় জানালেন—“.....producing a timely play in a national language and consequently broadening its audience is undoubtedly a major cultural event”^{৫২} আবার সরোজ দত্ত ‘স্বাধীনতা’

পত্রিকায় লিখেছিলেন — “মূলকে ক্ষুন্ন না করিয়া এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত বিদেশী রাখিয়া শুধু ভাষান্তর ও অভিনয়ের দ্বারা যে কি অসাধ্য সাধন করা যায়, ইহা তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।”^{৬০} পরবর্তীকালে তিনি ‘দৈনিকবাজার পত্রিকা’ নামে এই নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। প্রযোজনা করেছিল পিপলস লিটল থিয়েটার।

১৯৫২ সালে ৭ই মার্চ সেন্ট টমাস হল-এ পুনরায় অভিনীত হল ‘ডলস্ হাউস’ এর বাংলা রূপান্তর ‘পুতুলের সংসার’। এতে উৎপল অভিনয় করেন ‘তড়িৎ হালদার’ চরিত্রে। ১৯৫৩ সালে ২৩শে এপ্রিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে অভিনীত হয় সুনীল চট্টোপাধ্যায় অনুদিত ‘মার্চেন্ট অফ ভেনিস’ এর নির্বাচিত দৃশ্য। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে ‘সুনীল চট্টোপাধ্যায়েরই মৌলিক নাটক ‘কেরাণী’ অভিনীত হয়। সে বছরেই সেন্ট টমাস হল-এ ১৮ই জুন তারিখে রবীন্দ্রনাথের ‘অচলায়তন’ অভিনীত হল উৎপল দত্তের পরিচালনায় ও অভিনয়ে। তিনি ‘উপাধ্যায়’ চরিত্রে অভিনয় করেন। এ সময়ের জার্মান নাট্যকার Wolf এর ‘প্রফেসর মামলক’ নাটকটি বাংলা ভাষায় অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন লিটল থিয়েটার গ্রুপের অভিনেতারা।

লিটল থিয়েটার গ্রুপের বাংলা শাখা প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই তাঁদের প্রধানত অনুবাদের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এর আগে ইংরেজি নাটকের অভিনয় করেই এঁরা পরিচিত হয়েছিলেন। প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় কিছুটা প্রয়োজন কেন্দ্রিক—রঙপুর শাখার প্রয়োজনের কথা ভেবে। গণনাট্য সংঘের দীক্ষার ফলে— বাংলায় নাটক করবার যে কথা উৎপল ভেবেছিলেন তা এই প্রয়োজনের দিক থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায় ১৯৫০ সালের ২৩ নভেম্বর শিউলি মজুমদার অনুদিত ‘গোস্টস্’ অভিনয় করার পর এঁরা কেবল অনুবাদ নাটকের উপরেই নির্ভর করেছেন। এর মধ্যে একটি মৌলিক বাংলা নাটক অভিনীত হয়েছিল— সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের ‘কেরাণী’। তারপর লিটল থিয়েটার ‘অচলায়তন’ অভিনয় করে। ১৯৫০ সালে বাংলা নাটক শুরু করার পর এঁরা মৌলিক নাটকের খোঁজে রবীন্দ্রনাথে এসে পৌঁছিলেন। গণনাট্য সংঘে উৎপল ‘বিসর্জন’ নাটকের পরিচালনা করেছিলেন। তারপর এবার আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরে এলেন। ‘বিসর্জন’ নাটক করবার সময় গণনাট্য সংঘে “একটা ব্যাপক ফিসফাস চালু”^{৬১} হয়েছিল। “বিসর্জন অভিনয় করেছি, সুতরাং আমি স্বভাবতই ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া ভাবধারা আমদানি করে গণনাট্যের সংগ্রামী ঐতিহ্য নষ্ট করতে চাইছি।”^{৬২} যাইহোক গণনাট্যের ‘বিসর্জন’ প্রযোজনা ভালো হয়নি। উৎপল দত্ত একে ‘কদর্য প্রযোজনা’ বলে অভিহিত করেছেন। ‘বিসর্জন’ প্রযোজনার পক্ষে উৎপলের দুটি কারণ ছিল। প্রথমত তিনি বলেছেন— “ক্লাসিক নাটকের ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের নাট্যাভিনয়ের যোগ দরকার। বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত না হলে নতুন ঐতিহ্যের দিক

এক কদমও এগোনো যায় না।”^{৬৬} আর দ্বিতীয়ত ‘গণনাট্য আন্দোলনে নাটকের সমস্যা’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে ‘বিসর্জন’ নাটকের পক্ষ সমর্থন করে লিখেছেন— “ধর্মের অনুশাসনের নির্বুদ্ধিতাকে উদ্ঘাটিত করা রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক আমরা করতে পারি।”^{৬৭} রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে চিন্তা ভাবনা পঞ্চাশের দশকে শুরু হয়েছিল। শম্ভু মিত্র বহুরূপীতে এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটান। প্রধানত মৌলিক নাটকের অভাবে, আর রবীন্দ্রনাটক সম্বন্ধে উৎপলের বিশ্লেষণে তার ইতিবাচক ভূমিকার জন্য উৎপল রবীন্দ্রনাটক মঞ্চে অভিনয় করেন। হয়তো পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষাও তার একটা কারণ।

১৯৫৩ সালে উৎপল এল.টি.জি-র প্রযোজনায় ‘অচলায়তন’ অভিনয় করলেন। অরূপ মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন রবীন্দ্র প্রতিভার জ্যোতির্ময় আলোয় উৎপল মানস আকৈশোর লালিত ও বিকশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ‘চায়ের ধোঁয়া’ বইতে নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা এসেছে যেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষত তাঁর নাট্য সৃষ্টির প্রতি উৎপল দত্তের শ্রদ্ধোক্তির অভাব নেই। “রবীন্দ্রনাথ জীবিত অবস্থায়ই জনপ্রিয় নাট্যকার হিসেবে জনতার প্রণাম কুড়িয়ে গেছেন।”^{৬৮}

তাছাড়া নাটকে উৎপল যা বলতে চান—জনগণের চেতনার সম্প্রসারণ এবং রাজনৈতিক দৃষ্টির জাগরণ, তার সূত্র রবীন্দ্রনাটকে আছে বলে তিনি মনে করেন। চায়ের ধোঁয়া বই-এর ‘জনপ্রিয়তা ও আলমগীর’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন— “রবীন্দ্রনাথ ‘অচলায়তনে’ ধর্মান্ততার বিভীষিকা দেখিয়েছেন; ‘বিসর্জন’ -এ ভয়াল দেবীমূর্তিকে পদতলে নিক্ষেপ করেছেন। ওই প্রচণ্ড পুরুষটিই পেরেছেন।”^{৬৯} কাজেই রবীন্দ্র নাটক সম্বন্ধে পরবর্তী এ সব উক্তি থেকেও বোঝা যায় উৎপলের বিশ্লেষণ অনেকটাই ইতিবাচক ছিল। ‘অচলায়তন’ সম্বন্ধে পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের বক্তব্যের বিরোধিতা করে তিনি একটি বিতর্কেও জড়িয়েছিলেন। ডাঙ্গে অচলায়তন নাটকটিকে ‘বৈপ্লবিক’ রচনা বলেছিলেন অন্যদিকে উৎপল দত্ত এ নাটকটিকে সামাজিক অসাম্য ও বিভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে দেখেছিলেন। ডাঙ্গে এ নাটকটির প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে ruthless revolutionary democrat বলেছিলেন, উৎপল তা বলতে অস্বীকার করেন। উৎপল দত্তের স্মৃতিচারণ থেকে জানতে পারি সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বহু যত্নে, শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম এই অভিনয়ে যোগ দেন। উৎপল দত্ত লিখেছেন— “ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ৩৫০০০ দর্শকের সামনে বিনি পয়সায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় স্মৃতিপটে আঁকা থাকবে চিরদিন। শান্তি সম্মেলনের পক্ষ থেকে সংগঠিত এই অনুষ্ঠানে বুবোছিলাম রবীন্দ্রনাথ নতুন করে প্রাণ পাবেন মেহনতি মানুষের স্পর্শ পেয়ে।”^{৭০} তিনি এই

লেখাতেই মস্তব্য করেছেন— “কতিপয় বুদ্ধিজীবীর সমাধি সদৃশ আড্ডা থেকে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধার করে একদিন গ্রামে-কারখানায় ছড়িয়ে দেবে শ্রমিকশ্রেণী।”^{৬১} সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অচলায়তন প্রযোজনা সম্বন্ধে লিখেছেন— “উৎপল দত্ত পরিচালক হিসেবে এ নাটকে আঙ্গিকের অভিনবত্বে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।”^{৬২}

১৯৫৩ সালে ‘অচলায়তন’ প্রযোজনার পর আবার তিনি ইংরেজি নাটকের অনুবাদে ফিরে গেছেন। ১৯৫৩ সালে কেণ্ডালের দলে যোগ দিয়ে কয়েকটি ইংরেজি নাটকের অভিনয় করলেন। ১৯৫৪ সালে আবার ‘ম্যাকবেথ’-এর অনুবাদ অভিনয় করলেন। এই ‘ম্যাকবেথ’ প্রযোজনায় শোভাসেন প্রথম লিটল থিয়েটার গ্রুপে অভিনয় করেন। ‘স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লালদুর্গ’ রচনায় শোভাসেন লিখেছেন—

“১৯৫৪ সাল। একদিন আমাদেরই পরিচিত একটি ছেলে এসে আমাকে জানাল ‘উৎপল দত্ত আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।’ ওঁরা বাংলায় শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ করছেন। তাতে আপনাকে লেডি ম্যাকবেথ করতে হবে। উৎপল দত্তের অনুরোধ।... উৎপল দত্তও তখনই শেক্সপিয়ারের অভিনয় ও পরিচালনায় ভারতবর্ষের মধ্যে বিখ্যাত। ... উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে যাবার সুযোগ হারাতে চাইলাম না।”^{৬৩}

১৯৫৪ সালের ৭ই নভেম্বর নিউ এম্পায়ারে এই ‘ম্যাকবেথ’ অভিনীত হল। শোভাসেনের কথা থেকে প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতা উদ্ধৃত করছি—

“বেশ পরিশ্রম করে একনিষ্ঠ সমবেত প্রচেষ্টায় ও উৎপলের অসাধারণ শিক্ষায় ম্যাকবেথ তৈরি হল। নিউ এম্পায়ারে প্রথম শো। প্রথম রাত্রির অনিশ্চিতি দুর্ভাবনা ও মানসিক চাপ নিয়ে সব প্রস্তুত।... ফার্স্ট বেল বাজল। বুক দুৰু দুৰু করছে।... হঠাৎ পেছনে শুনি এক বিরাট দীর্ঘশ্বাস ও স্বগতোক্তি, ‘হে ভগবান’। শিশির ভাদুড়ির অন্তরঙ্গ বন্ধু অভিনেতা কাস্তি মুখোপাধ্যায় নার্ভাস হয়ে ঈশ্বরকে ডাকছেন।”^{৬৪}

শোভাসেনের কথা থেকে জানতে পারি ‘নাটকটা জমে গিয়েছিল’। গ্রামেগঞ্জে শহরে অনেক জায়গায় ম্যাকবেথের অভিনয় হয়েছে। একটি হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে ‘এক বছরে ৯৭টি শো’ হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, ‘ম্যাকবেথ’ অভিনয়ে বাংলা লিটল থিয়েটার সাবালকত্ব পেল। এর আগে তিনবার ‘ম্যাকবেথ’-এর অভিনয় করেছেন উৎপল। প্রথম বার অ্যামেচার শেক্সপিరిয়ানস্ দলে নির্বাচিত অংশ, দ্বিতীয়বার কেণ্ডালের পরিচালনায় শেক্সপিరిয়ানা ইন্টারন্যাশন্যাল থিয়েটারে আর তৃতীয়বার এল.টি.জির প্রযোজনায় উৎপলের নিজের প্রয়োগে। কিন্তু এই চতুর্থবারের ‘ম্যাকবেথ’-এর অভিনয়ই যথেষ্ট উদ্দীপনা তুলতে পেরেছিল। উৎপলের

পরিচালনা প্রসঙ্গে শোভাসেনের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি। তাঁর নাট্যসংলাপ উচ্চারণের ভঙ্গির কথাও তিনি বলেছেন— “উৎপলের স্কুলিং-এ কোনো কথায় কোনো সুর নেই কিন্তু আছে দ্রুত ও শ্লথ গতির খেলা।... এই স্টাইলটি খুব কার্যকরী ও অভিনব।”^{৬৫}

১৯৫৫ সালের মে মাসে যুব উৎসব উপলক্ষে রঞ্জি স্টেডিয়ামে ‘কালের যাত্রা’ নাটকের অভিনয় করে এল.টি.জি। আধুনিক পোষাকে ‘জুলিয়াসসীজার’ অভিনয় করে উৎপল-এ নাটককে চিরকালের অত্যাচারীর একটা রূপ দিয়েছিলেন। আগের কালের সীজার এর সঙ্গে একালের হিটলালের কোনো প্রভেদ ছিল না। ‘কালের যাত্রা’ নাটকেও এই মনোভাব থেকে প্রয়োজনা করা হল। উৎপল দত্তের প্রয়োজনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

“উৎপল দত্তের রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োজনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ‘কালের যাত্রা’। নাটকের প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রটিকে চোস্ত-পায়জামা, শেরওয়ানি, খদরের টুপি মায় বুকো লালগোলাপ সমেত পণ্ডিত জওহরলালের প্রতিকৃতি হিসেবে উপস্থিত করা হয়। সৈনিকদের পরনে ছিল সবুজ জলপাই রঙের সামরিক উর্দী, মাথায় লোহার হেলমেট ও হাতে স্টেন গান।”^{৬৬}

‘কালের যাত্রার’ পর আবার শেক্সপিয়ারের অনুবাদ নাটক ‘জুলিয়াস সিজার’ ও ‘টুয়েলফথ্ নাইট’ অভিনয় হয়েছে ১৯৫৬ সালে। এই বছর রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রহসন ‘গুরুবাক্য’ ও ‘সুম্মবিচার’ এবং মধুসূদনের ‘বুড় শালিখের ঘাড়ে রৌঁ’ ও বনফুলের ‘নবসংস্করণ’ প্রযোজিত হল। ‘বুড় শালিখের ঘাড়ে রৌঁ’ উৎপল দত্তের একটি ভালো প্রয়োজনা। এই নাটকের অভিনয় দিয়ে মিনার্ভা মঞ্চঃ এঁদের দলের অভিনয় যাত্রা শুরু হয়।

লিটল থিয়েটার গ্রুপের উদ্যোগে পরপর দু’বার নাট্যোৎসব পালিত হয়। এল.টি.জি তাদের প্রথম নাট্যোৎসব করে রঙমহল থিয়েটারে। তিন দিন ধরে এ নাট্যোৎসব পালিত হয়, ১৫, ১৬ ও ১৭ই জুলাই ১৯৫৭ সাল। এ তিন দিনে ক্রমশ অভিনীত হয় ‘তপতী’, ‘সিরাজদ্দৌলা’ ও ‘নীচের মহল’। তিনটিরই পরিচালক উৎপল দত্ত। শেষের নাটকটি ছিল নতুন প্রয়োজনা। বাকি দুটির অভিনয় আগেও হয়েছিল। এই ‘নীচের মহল’ নাটকটি ম্যাক্সিম গোর্কির ‘দ্য লোয়ার ডেপথস্’ নাটকের বাংলা রূপান্তর। বাংলা রূপান্তর করেন উমানাথ ভট্টাচার্য। এতে উৎপল গগন ও সাতিন চরিত্রে অভিনয় করেন। এল.টি.জি-র এই নাট্যোৎসবের সম্পর্কে দর্শন চৌধুরীর মন্তব্য— “সাধারণ রঙ্গালয়ে বাণিজ্যিক ও পেশাদারি ভাবে থিয়েটার প্রয়োজনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা এখান থেকেই সঞ্চিত হয়ে থাকবে।”^{৬৭}

১৯৫৮ সাল থেকে ১০ই ডিসেম্বর ‘বিশ্বরূপা’য় পালিত হয় এল.টি.জি-র দ্বিতীয়

নাট্যোৎসব। অভিনীত হয় উৎপল অনুদিত শেক্সপিয়ারের ‘ওথেলো’, পূর্ব অভিনীত ‘নীচের মহল’ এবং উৎপলের মৌলিক রচনা ‘ছায়ানট’। নিজের অনুবাদে ও মুখ্যভূমিকায় অভিনয়ে উৎপল দত্ত উজ্জ্বল করে তুললেন বাংলা ভাষায় ‘ওথেলো’ এর প্রযোজনা (৮ই ডিসেম্বর) ‘ছায়ানট’ -এ উৎপল অভিনয় করেন ‘নরেন্দ্র’ চরিত্রে।

১৯৫৯ সালে শ্যামল সেনের পরিচালনায় অভিনীত হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘একেই কি বলে সভ্যতা।’ এরই মাঝে ‘উৎপল দত্ত ও সম্প্রদায়’ নামে উৎপল বেশ কিছু পথ নাটিকায় অভিনয় করেন। যেমন ‘সৌরীন মাস্টারের সংসার’, ‘দৈনিক সন্দেশ’, ‘নয়া তুঘলক’, ‘মে দিবস’, ‘সমাজতন্ত্র’ প্রভৃতি। “গণনাট্য সংঘে পথ নাটকের যে প্রস্তুতি হয়েছিল, তারই বিকাশ ঘটল এখানে।”^{৬৮} ‘ছায়ানট’ (১৯৫৮) নাটকটি উৎপলের বাংলায় প্রথম মৌলিক রচনা।

“এর আগে মূল ইংরেজি নাটক, তারপরে ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ এবং অন্য নাট্যকারদের বাংলা নাটকের অভিনয় উপযোগী ঘষা মাজা ও সম্পাদনা এই ভাবে হাত পাকিয়ে নিয়ে উৎপল পুরোপুরি মৌলিক বাংলা নাট্য রচনায় হাত দিলেন। একেবারে অভিনয়ের প্রয়োজনেই তিনি নিজেই নাট্য রচনা শুরু করলেন। দশ বছর ধরে নাট্য প্রযোজনা, পরিচালনা এবং সম্পাদনা ও অভিনয়ের অভিজ্ঞতার পরেই উৎপল তাঁর প্রথম নাট্য রচনায় হাতে খড়ি করলেন।”^{৬৯}

নাট্যকার হিসেবে উৎপল দত্তের আত্মপ্রকাশ ১৯৫৮ সালে ‘ছায়ানট’ নাটক রচনার মধ্য দিয়েই।

গণনাট্য সংঘের সংস্পর্শঃ এদেশে প্রগতিশীল, চিন্তাশীল কিছু মহৎ ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বিশ শতকের চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’ (Indian people's Theatre Association) নামে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখা এই সংঘেরই একটি সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ সালের মে মাসে। “গতানুগতিক পেশাদারি মঞ্চার আওতার মধ্যে থেকেই তার সংস্কারের প্রচেষ্টায় এদেশে গণনাট্যের উদ্ভব নয়, তার উদ্ভব হয়েছে সমাজ মানসের এক রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কার্য কারণে।”^{৭০} ‘গণনাট্য সংঘ’ নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন তাতে নাটকের বিষয় বস্তু, চরিত্র, রূপ, কল্পনা এবং সর্বোপরি একটি বিশেষ ভাবাদর্শ বাংলা নাটকের ধারায় এক প্রাণের আবেগের সঞ্চার ঘটল। বাংলা নাট্যধারায় এক অভিনব ভাবনার উন্মেষ ঘটল। কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী মানুষের কথা গুরুত্ব পেল এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে সমষ্টিসত্ত্বের কথা প্রধান্য পেল। বস্তুতান্ত্রিক জীবন ভাবনা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের

প্রতি বিশ্বাস, কর্মে আবেগপ্রবণতার চেয়ে বুদ্ধি ও যুক্তির ব্যবহার, শোষক ও শোষিতের শ্রেণী নির্দেশ, নাটকে একক নায়ক চরিত্রের পরিবর্তে শোষিত শ্রেণীকে প্রাধান্য দেওয়া, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা এবং শাসন যন্ত্রকে ক্রটি পূর্ণ বলে চিহ্নিত করা এগুলি স্বাভাবিক ভাবেই নাটকে গৃহীত হল। বিষয়বস্তু, মঞ্চ ব্যবস্থা, আলো, সাজ, রূপসজ্জা, সংলাপ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটানোর প্রয়াস লক্ষিত হল।

গণনাট্য প্রযোজিত প্রথমদিকের নাটকের গানগুলিতে ফ্যাসিবাদ-সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে এবং প্রায় সব নাটকেই সমসাময়িক রাজনীতির কথা ফুটে উঠেছে। “অন্তত বাংলায় ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।”^{৭১} গণনাট্য সংঘের প্রভাবে বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক জগতের একটি বিপুল পরিবর্তনের জোয়ার এসেছিল।

“এই জোয়ার যতটা পরিমাণগত সম্ভবত তার চেয়েও বেশি ছিল গুণগত। তত্ত্বগতভাবে সাংস্কৃতিকে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিভূতের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করার-সাংস্কৃতিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করার প্রচেষ্টা সেদিন শুরু হয়েছিল তা সেদিনের দর্শক শ্রোতাকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল, এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়; দর্শক শ্রোতার এক বিপুল অংশ সাংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের দীর্ঘলালিত ধারণা পরিবর্তনে প্রয়াসী হয়ে উঠেছিলেন।”^{৭২}

কেবল তত্ত্বগত ভাবেই অভিনব শুধু তাই নয়, সে সময়ের সাংস্কৃতি জগতের বেশ কিছু প্রতিভাবান শিল্পীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমেও গণনাট্য সংঘের অনেক প্রয়োজনা সমসাময়িক প্রদর্শ শিল্পের মানকে অতিক্রম করে অনেক উচ্চতর মানে পৌঁছাতে পেরেছিল। গণনাট্য সংঘের এরকমই একজন সক্রিয় শিল্পী ছিলেন উৎপল দত্ত। তিনি লিটল থিয়েটার গ্রুপ থেকে বের হয়ে ১৯৫১ সালে গণনাট্য সংঘে যোগদান করেন।

গণনাট্য সংঘে সক্রিয় ভাবে যোগ দান করার ঘটনা সম্পর্কে উৎপল দত্তের মন্তব্য— “শুরু হল নাটকের মাধ্যমে মানুষের কথা তুলে ধরা।”^{৭৩} ১৯৫০ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী কোলকাতা হাইকোর্টের রায়ে কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর থেকে যখন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল তখন বৈধ রাজনৈতিক দলের কর্মীরা প্রকাশ্যে তাদের কাজকর্ম শুরু করে। যে সব নাট্যকর্মী গণনাট্য দ্বারা প্রভাবিত অথচ গণনাট্যের বাইরে আছেন তাদেরকে সংঘে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ শুরু হল। এ সময়ে উৎপল এল.টি.জি-এর হয়ে কাজকর্ম করছিলেন। কিন্তু তাঁর নাট্যভাবনা ও মানসিকতা গণনাট্য আন্দোলনের সপক্ষেই ছিল। পার্টি মুক্তির বিজয় উৎসবে উৎপল দত্তের

এল.টি.জি আমন্ত্রিত হয়। স্পার্টা গ্রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত এই নাট্যোৎসবে অভিনীত হল এল.টি.জি. -এর প্রয়োজনায় ‘টিল দ্য ডে আই ডাই’ নাটকটি। সে সময়ে গণনাট্য সংঘের সম্পাদক নিরঞ্জন সেনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। “গণনাট্য সংঘের আদর্শের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পেরেই তিনি লিটল থিয়েটার গ্রুপ থেকে ছুটি নিয়ে গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। যুক্ত হলেন মধ্য কোলকাতার গণনাট্য শাখায়।”^{১৪} গণনাট্যের এই সেন্ট্রাল স্ক্র্যাডে যুক্ত ছিলেন ঋত্বিক ঘটক, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পানুপাল, শোভা সেন, সুনীল দত্ত প্রমুখরা। এ সময়ে শম্ভু মিত্র ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী সংঘ থেকে বের হয়ে নতুন নাট্যদল গঠন করেছেন। গণনাট্য সংঘের এই ভাঙনের কালে উৎপল এসে নতুন করে সংঘের কর্মীদের মধ্যে নব উদ্যমে প্রাণের সঞ্চার ঘটালেন। কোলকাতায় তখন সর্বভারতীয় শান্তি উৎসব চলছিল। সেখানে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পীরা তাদের শিল্প কর্ম নিয়ে হাজির হয়েছেন। এদিকে শাসক দলের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেয়ে সদ্য মুক্ত রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক শাখা গণনাট্য সংঘ যেন নবজীবন ফিরে পেল।

গণনাট্য সংঘের হয়ে উৎপল দত্ত প্রথম অভিনয় করলেন পানুপালের লেখা ‘ভাঙা বন্দর’ নাটকে। অভিনয় হয় রঙমহলে, ১৭ ই এপ্রিল ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। এ নাটকে উৎপল গজানন নামক এক স্মাগলার চরিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। এর পর নিজের লেখা পোস্টার ড্রামা ‘পাশপোর্ট’ এ অভিনয় করেন। গণনাট্য সংঘের হয়ে প্রথম পরিচালনা করলেন রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটকটি (২ অক্টোবর ১৯৫১ খ্রী.)। এ নাটকে তিনি নিজেও গোবিন্দমানিক্য চরিত্রে অভিনয় করেন। পরে ‘অফিসার’ এবং ‘ম্যাকবেথ’ নাটকের প্রথম অঙ্ক (বাংলা রূপান্তরে)- এ দুটি নাটকেরও পরিচালক ছিলেন উৎপল দত্ত। গোগলের ‘রেভিজর’ নাটকের বাংলা রূপান্তর ‘অফিসার’ (১৬ই ডিসেম্বর ১৯৫১)। উৎপল এ নাটকে ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকায় অভিনয় করেন। আর ‘ম্যাককেথ’-এ তিনি নাম ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করেন। উৎপলের এই অভিনয় দেখে শিশির কুমার ভাদুড়ী খুবই মুগ্ধ হন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাছাড়া শোভা সেনের ‘লেডি ম্যাকবেথ’ও উচ্চমানের হয়েছিল। এর প্রথম অভিনয় হয়েছিল শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ২৩শে এপ্রিল ১৯৫২ সালে।

১৯৫১-৫২ তে ঋত্বিক ঘটক লিখিত ও পরিচালিত ‘দলিল’ নাটকে উৎপল দত্ত ‘হরেন পণ্ডিত’ চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৫১ সালে উমানাথ ভট্টাচার্যের ‘চার্শিট’ ও ১৯৫২ সালে পানু পালের ‘ভোটের ভেট’ এ দুটি পোস্টার নাটকের অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেন উৎপল দত্ত। ‘চার্শিট’ নাটকটি বন্দি মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা।

গণনাট্য সংঘের হয়ে উৎপল দত্ত সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেছেন— রবীন্দ্রনাথের

‘অচলায়তন’, গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘সিরাজদৌলা’, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ও ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ’, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘অলীকবাবু’ নাটকগুলি। শুধু পরিচালনায় নয় এসব নাটকে উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করেও উৎপল বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

কিন্তু উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘের হয়ে বেশি দিন কাজ করতে পারলেন না। ১৯৫১-৫২ সালের মধ্যে মাত্র দশ মাস তিনি গণনাট্য সংঘে ছিলেন। তারপর তাঁকে সংঘ ছাড়তে হল। এ বিষয়ে তার উপলব্ধি—“গণনাট্য সংঘে থাকতে পারলাম না।”^{৭৫} থাকতে না পারার বেশ কিছু কারণ ছিল। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের জবান বন্দী—

“বিসর্জন’ অভিনয় করেছি, সুতরাং আমি স্বভাবতই বুর্জোয়া ভাবধারা আমদানী করে গণনাট্যের সংগ্রামী ঐতিহ্য নষ্ট করতে চলেছি।..... আমি একাধারে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী বিচ্যুতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পড়লাম। কোনো মিটিংয়ে বলতে চেষ্টা করেছি গণনাট্য সংঘ একই সঙ্গে বিসর্জন এবং চার্জশীট অভিনয় করে তার প্রকৃত দায়িত্ব পালন করেছে, ক্লাসিক ও প্রচার পাশাপাশি বজায় রেখেছে, প্রোপাগাণ্ডা ও এজিটেশন দুটাই চালু রেখেছে। উত্তর নেই, মৌন।”^{৭৬}

সংঘের নেতৃত্বের একাংশ উৎপল দত্তকে কোন অজ্ঞাত কারণে নানা উদ্ভট রাজনৈতিক বিচ্যুতির দায়ে অভিযুক্ত করতে লাগলেন। তাঁকে নিয়ে আড়ালে আড়ালে একটা ব্যাপক ফিসফাস চালু হয়েছিল। এছাড়া ‘এপিক থিয়েটার’ পত্রিকায় উৎপল দত্তের একটি সাক্ষাৎকার পুনর্মুদ্রিত হয়, যা আগে ‘পর্বাস্তর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারে উৎপল জানিয়েছেন—

“আর একটা কারণ ছিল—আমরা যে পথনাটিকা গণনাট্য সংঘে নামালাম, গণনাট্য সংঘের ব্যানারেই তা হচ্ছিল। তাতে কোন কোন গণনাট্য সংঘের নেতা বক্তব্য তুলেছিলেন। কেননা, তার আগেই, আপনি জানেন ৪৮/৪৯-এ পার্টি ব্যানড হয়ে গেছিল। এবং তখন পার্টি বামপন্থী বিচ্যুতির ফলে সমস্ত সংগঠনকে পার্টির সঙ্গে এক করে ফেলে একটা বিশ্রী নজির সৃষ্টি করে। এইখানে আবার গণনাট্য সংঘ ডাইরেক্টলি কমিউনিস্ট পার্টির প্ল্যাটফর্ম থেকে অভিনয় করছে। এতে অনেকে আপত্তি করেছিলেন, এবং আমি এটা সমর্থন করেছি। এটাও একটা কারণ ছিল।”^{৭৭}

অর্থাৎ পার্টির প্ল্যাটফর্ম থেকে নাটক না করার পক্ষে ছিলেন উৎপল দত্ত। তাঁর মতে গণনাট্য সংঘের অবশ্যই একটা আলাদা আইডেনটিটি থাকবে। গণনাট্য সংঘের নেতাদের অভব্য আচরণ, ঈর্ষাপরায়নতা ছিল উৎপলের সংঘ ছাড়ার অপর একটি কারণ। এই নেতাদের মার্কস, এঙ্গেলস

সম্পর্কে ভালোধারণাও ছিল না। অথচ “তারাই উৎপলের নামে কুৎসা রটাতে শুরু করে। উৎপল অতিবাম টুটফি পছন্দী, উৎপল কেয়ারিস্ট, নিজের আখের গোছাবার জন্যই গণনাট্য সংঘে এসেছে। শেষ পর্যন্ত মদ্যপান, উৎচ্ছ্বলতা, অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ ইত্যাদি কারণও তার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে।”^{৭৮}

যা হোক দশ মাস পর উৎপল আবার এল.টি.জি -তে যোগ দেন। কিন্তু এই দশ মাসের মধ্যেই তিনি অনেকগুলি নাটকের অভিনয় ও পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর এই কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে গণনাট্য সংঘের নাটক শুধু মাত্র সমকালীন সমাজদ্বন্দ্ব কিংবা কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের সংগ্রামের নাটকই শুধু নয়, সেটা তো থাকবেই, তার পাশাপাশি তিনি সংযোজন করলেন কিছু ক্লাসিক নাটক। এর কারণ হিসেবে তিনি বুঝিয়েছেন যে, শোষক শ্রেণী ক্লাসিক নাটককে তাদের মুখপত্র হিসেবে, তাদের মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে চায়। তাই প্রয়োজনে এগুলিকে মসীলিপ্ত করে ফেলতে হবে কিংবা স্মৃতির অতলে তলিয়ে দিতে হবে। এপ্রসঙ্গে উৎপল জানিয়েছেন —

“শোষিত শ্রেণীর কর্মীর অন্যতম দায়িত্ব অতীতের মহৎ শিল্প সাহিত্যকে যথার্থ মূল্যায়ন করে নিজ শ্রেণীর প্রয়োজনে ব্যবহার করা এবং শোষক শ্রেণীর দাবিকে নস্যং করে তার শ্রেণী চরিত্রকে জনমানসে হেয় করে তোলা। কারণ শোষকের একটা চক্রান্ত হল অতীতের শিল্প সাহিত্যের সুমহান ঐতিহ্যকে জন সমক্ষ থেকে আড়ালে সরিয়ে রাখা এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা।”^{৭৯}

শুধু নাটক অভিনয় ও পরিচালনাই নয়, এসব নাটক অভিনয় করতে গিয়ে উৎপল দত্ত সংঘের নাট্যকর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, কর্তব্যবোধ ও নাট্যনিষ্ঠা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। যে কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ সর্বোপরি আন্তরিকতা নিয়ে উৎপল গণনাট্য সংঘের ভাঙনের সময়; আপদকালীন সময়ে এসে সংঘের মধ্যে নতুন করে প্রাণের আবেগ সঞ্চার করেছিলেন। সেই আন্তরিকতাকে তিনি সংঘ ছাড়ার পরেও ভুলতে পারেন নি। তাই সংঘের কিছু ব্যক্তির প্রতি বিরাগভাজন হলেও তিনি কিন্তু কখনই গণনাট্য ধারা বা তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। দেশের কিংবা বিদেশের মহান গণনাট্য ধারার প্রতি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল ছিলেন। এই দশ মাসে তিনি সংঘের হয়ে বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে পরিভ্রমণ করলেন। রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিক্রিয়াগুলি বুঝে নিলেন। আর বুঝতে পারলেন নাটক করা হয় যে দর্শকের জন্য, সেই দর্শক সেই মানুষগুলির অন্তরের কথা। এদের কথাই তিনি নাটকের মাধ্যমে বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। আর এই অনুভূতির মাধ্যমেই তিনি নাটকের বিষয়, ভাবনা এবং উপস্থাপনার

ক্ষেত্রে এক নতুন জগতের প্রবেশ করলেন। এই দশ মাসের অভিজ্ঞতায় উৎপলের প্রতিক্রিয়া—
“এই দশ মাসে যা সঞ্চয় করেছি, তার তুলনা কোথায়?”^{৮০}

গণনাট্য সংঘে থাকাকালীন স্বল্প সময়ের মধ্যে উৎপল ‘ভাস্কাবন্দর’, ‘দলিল’, নামক পূর্ণাঙ্গ নাটকে অভিনয় করেছেন। এ নাটকগুলির বিষয় হল সমকালীন রাজনীতি ও সমাজনীতি। তাছাড়া ‘ভোটের ভেট’, ‘পাশপোর্ট’, ‘চার্জশীট’ প্রভৃতি পথনাটকে অভিনয় করেছেন— যেগুলির বিষয় একেবারেই সমকালীন কোন বিশেষ ঘটনা। ‘বিসর্জন’-এর মতো ক্লাসিক নাটকেও অভিনয় করেন। আবার ‘ম্যাকবেথ’, ‘অচলায়তন’, ‘সিরাজদ্দৌল্লা’, ‘অলীকবাবু’, ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌ’ প্রভৃতি নাটকেও অভিনয় করেন। একদিকে শেক্সপিয়ারের নাটক উৎপলকে যেমন নাট্যজগতে টেনে এনেছিল অন্যদিকে জিওফ্রে কেণ্ডাল দক্ষ গুরুর মতো তাঁকে নাট্য প্রয়োজনার পাঠ দিয়েছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, থিয়েটার শুধু বিশুদ্ধ একটা শিল্প কলা হিসেবেই বিবেচিত হয় না, থিয়েটারের মাধ্যমে জনগণের কাছে যাওয়া এবং জনচেনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলাই হল বড় কাজ। থিয়েটারে এই আন্তর্জাতিক অভিধাকে স্বীকার করেই উৎপল দত্ত বাংলায় নাটক রচনা ও প্রয়োজনায় হাত দিয়েছিলেন। “গণনাট্য সংঘ তাঁকে বাংলা ভাষা ও বাংলা নাটকের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। মূল আকর্ষণ ছিল নাটকের সমাজভাবনা— ভাবের সাজু্য পাওয়াতে ভাষাটা রপ্ত করতে অসুবিধে হয় নি। শুরু হল উৎপলের বাংলা নাটকের পর্ব।”^{৮১} গণনাট্য সংঘ পরবর্তী এল.টি.জি.-তে উৎপল যে বাংলা শাখার হয়ে বিভিন্ন বাংলা নাটকের অভিনয় পরিচালনা করেন তার শুরু হয়েছিল এই গণনাট্য পর্যায়েই।

গণনাট্য সংঘে অভিনয় ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে উৎপল দত্ত নাট্য প্রজ্ঞানার ভাবনা গুলিকে যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মহান গণনাট্য আন্দোলনের শিক্ষা উৎপলের নাট্য জীবনে বিপুল মাত্রায় প্রাণাবেগ সৃষ্টি করল। উৎপলের ভাষায়—“গণনাট্য সংঘ আমাকে জনতার মুখরিত সখ্যে নিয়ে এল। একটা ঘুম ভেঙে গেল, একটা আলোকিত জাগরনে মেতে উঠলাম।”^{৮২} উৎপল দত্ত ১৯৪৮ সাল থেকে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হবার পর থেকে তাঁর নাট্যভাবনাতে যে পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করা যাচ্ছিল, তিনি গণনাট্য সংঘে যোগদানের ফলে তার মাত্রা পূর্ণরূপ পেল। এই সংঘের সংস্পর্শেই উৎপল দত্তকে সমকালীন যুগভাবনা ও জনসাধারণের মানসিকতা বুঝে নিতে সাহায্য করেছিল।

উৎপলের জীবনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভাব : উৎপল দত্তের জন্মলগ্নই ছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তাই স্বাভাবিক ভাবেই সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক

অস্থিরময় পরিস্থিতির প্রভাব এসে পড়েছিল তার জীবনে অল্প বয়স থেকেই। কী জাতীয়, কী আন্তর্জাতিক দুই ক্ষেত্রেই তিনি সমকালীন প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেননি।

“তখন তার বয়স মাত্র ১৪ বছর। এই সময় থেকে নাটক ও মঞ্চ প্রসঙ্গে ব্যাপক পড়াশুনা শুরু। নিয়মিত সংবাদ পত্র ও পত্র-পত্রিকার পঠন পাঠনের মধ্য দিয়ে কিশোর মনে প্রতিবাদের ভাবনা স্ফূরিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত লালফৌজের প্রতিরোধ ও প্রতি আক্রমণের ঘটনা তাঁর মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল।”^{৮৩}

অল্প বয়স থেকেই এরকম পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিখ্যাত বইগুলির পঠন-পাঠনের মাধ্যমে তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারের বিস্তার ঘটেছিল এবং তাঁর মনের মধ্যে সমকালের এই প্রভাব থেকে মানুষের কিভাবে মুক্তি হতে পারে, তার সন্ধান চলেছিল।

আমাদের দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি। তখন থেকেই এদেশে ও বিদেশে ঘটেছিল বিভিন্ন ঘটনার উত্থান-পতন। ১৯৪০ এর দশকে দেখা দেয় এক উত্তালময় পরিস্থিতি। মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করলে তখন থেকেই বাংলাকে দু’ভাগে ভাগ করবার একটা প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। ১৯৪১ সালে বাঙালির ভাবজগৎকে শূন্য করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরলোকে গমন করলেন। আবার সুভাষচন্দ্র বোসও অন্তর্হিত হলেন। ১৯৪২ সালে শুরু হয় ‘ভারত ছাড়া আন্দোলন’। সারা দেশ তখন মাতোয়ারা হয়ে উঠল। ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যেন কাটা ঘায়ে লবনের ছিটে হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই পঞ্চাশের মঘন্তরে সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাল, কত মানুষ সর্বহারা হয়ে পড়ল। আর মুনাফাবাজ, বেনিয়া রাজনীতিকের মেলবন্ধন, কালোবাজারী, মজুতদারির হাত ধরাধরি করে চলার আতাত, মানুষের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। সমস্ত দেশের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল এই মঘন্তর। “সেদিন দুর্ভিক্ষে সব বাঙালি হয়তো মরেনি, কিন্তু সমগ্র বাঙালির মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটিয়ে দিয়েছিল এই সর্বনাশা মঘন্তর। মানুষের সঙ্গে মানুষের পারিবারিক সামাজিক পারস্পরিক সম্পর্কগুলো বিনষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল।”^{৮৪}

১৯৩৯ সালে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪৫ সালে সমাপ্তি ঘটল। কিন্তু তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল এদেশ সহ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তারই সঙ্গে ফ্যাসিবাদের উত্থান, অগ্রাসী মনোভাব বিস্তার ও অত্যাচার সমগ্র পৃথিবীতে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সমস্ত চিন্তাশীল মানুষের টনক নড়ে। তাই লগুনে অনুষ্ঠিত ‘ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ রাইটার্স’ এর দ্বিতীয় অধিবেশনে ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের তরফ থেকে একটি ম্যানিফেস্টো পাঠানো হয়েছিল। যেখানে ভারত থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন মূলকরাজ আনন্দ। এই ম্যানিফেস্টোতে ঘোষিত হয়েছিল—

“বর্তমানে বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া পৃথিবীকে গ্রাস করতে চলেছে। ফ্যাসিবাদী শক্তি তার সামরিক স্পর্ধায় মানুষের ক্ষুধার আত্ননাদকে বন্দুকের গুলিতে স্তব্ধ করতে চাইছে এবং শক্তির উন্মত্ততায় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চাইছে।”^{৮৫}

১৯৪৬ সালে মানুষের ধর্মান্বিতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হানাহানিতে বাঙালির যতটুকু মূল্যবোধ অবশিষ্ট ছিল তা যেন ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক মুহূর্তে এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মানুষ হতবাক হয়ে গিয়েছিল; মানুষের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুকে লক্ষ্য করে মানুষ সেদিন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।

অবশেষে দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্ত হল ভারতবর্ষ। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীন হল এই দেশ। কিন্তু সেই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির জীবনে অভিশাপ হয়ে নেমে এল দেশভাগের যন্ত্রণা, তার সঙ্গে সদ্য স্বাধীন বাংলার অর্থনীতি ও সমাজ বিন্যাস ভাঙনের মুখে পড়ে গেল। বিপর্যস্ত হল বাঙালির নিজস্ব ভৌগোলিক অখণ্ডতা।

স্বাধীনতার পর নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও নতুন করে দেশ গড়ে তোলার কাজ শুরু হল। ১৯৫০ সালে ভারত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৫২ সালে সারা দেশ ব্যাপি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশের স্বাধীন সার্বভৌম সরকার গঠন পর্ব শেষ হল। শুরু হল ভারতের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচি। আন্তর্জাতিক ভাবনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশীয় নানা ভাবনার প্রসার মানুষের মনে বিস্তারিত হতে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এসমস্ত ভাবনা পরিকল্পনা উধাও হয়ে গেল।

দেশ স্বাধীন হবার পর দেখা গেল ইংরেজদের দেশ শাসনের নামে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের ইতিহাসের পরে স্বদেশবাসীর হাতেই আবার লুণ্ঠিত হতে থাকল ভারতবর্ষ। বাঙালির জীবনে স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাথমিক উদ্দাদনা ক্রমে হারিয়ে যেতে লাগল নানা বিফলতায়, হতাশায়, অপ্রাপ্তিতে। তথাকথিত মুনাফাবাজ, মজুতদার, কালোবাজারীর দল সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের রূপের বদল ঘটিয়ে দেশের শাসন ক্ষমতায় বহাল তবীয়তে আসীন হয়ে রইল। স্বাধীনতার সব আশ্বাস যেন ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে উঠল; পরিস্থিতি পিরিবর্তিত হতে থাকল। ফলে “সামাজিক জীবনে যে অসহায়তা ও নিরালম্ব অবস্থার সৃষ্টি হলো এবং রাজনীতির জীবনে যে বিশ্বাস ভঙ্গের পরিবেশ তৈরি হলো, সেখান থেকেই সেই বাস্তবতার রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়েই মানুষের নানা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে চলল পশ্চিমবঙ্গে।”^{৮৬} ফলে ক্রমশই শুরু হল নানা প্রতিবাদ, আন্দোলন, ধর্মঘট, মিটিং মিছিল। বাংলার জনজীবন যেন উত্তাল হয়ে উঠল এবং নতুন জীবন গড়ে তোলার শপথ যেন বৃহত্তর সংগ্রামের রূপ ধারণ করল।

স্বাধীনতার পর থেকেই পূর্ব বাংলাতেও পাকিস্তানের নয়া ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল। ক্রমে তা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করল।

১৯৫১ সালের বন্দী মুক্তি আন্দোলন থেকে ১৯৬৫ সালের খাদ্য আন্দোলন পর্যন্ত বাঙালির ক্ষোভের জ্বালা ক্রমে আন্দোলন, মিটিং মিছিলের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। এসব জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্ত ঘটনার প্রভাব উৎপলের চিন্তার জগৎকে ক্রমশ পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। তাই—

“নাট্যকার হিসেবে তিনি সবচেয়ে আধুনিক এই অর্থে যে, তাঁর নাটকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী চিন্তা ধরা পড়েছে। এ চিন্তা তাঁর ইতিহাস চেতনার ফসল এবং এই ইতিহাস চেতনার ভিত্তি ছিল শ্রেণীসংগ্রাম। ... তাঁর রচিত নাট্যতালিকার দিকে তাকালেই নাটকের বিষয় বস্তু নির্বাচনে একটি সুস্পষ্ট চিন্তাধারার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতীতের প্রায় প্রত্যেকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণ-বিপ্লবের কাহিনী তাঁর নাটকের বিষয় বস্তু। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, সন্যাসী বিদ্রোহ, ওয়াহাবি আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত অধ্যায়, আজাদহিন্দ ফৌজের দুঃসাহসিক অধ্যায়, ভারতের নৌবিদ্রোহ, দেশ বিভাগের মর্মস্বত্ব ঘটনা ইত্যাদি। এতো গেল দেশের কথা — পাশাপাশি গোটা বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের মরণপণ সংগ্রামের ঘটনাগুলিও তাঁর নাটকে ধরা পড়েছে, গভীর ইতিহাসবীক্ষার আলোকে। পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র গঠনের যে ঘটনা আজও সর্বহারা শ্রেণীর চোখের মণি সেই প্যারি কম্যুন, অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব ও উত্তরকাল, ফ্যাসি বিরোধী সংগ্রাম, চীনের বিপ্লব, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া, একান্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, এমনকি অতি সম্প্রতিকালে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের কলঙ্কজনক ভূমিকা সবই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর নাটকের বিষয় বস্তুতে।”^{১৮৭}

মিনার্ভা পর্ব : উৎপল দত্তের জীবনে মিনার্ভা পর্ব এক গৌরবময় অধ্যায়। স্বাধীনোত্তর কালে কোলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে যে ধরনের নাটকের অভিনয় হতো তাতে দেশ ও মানুষের মধ্যে যে পরিবর্তিত ক্ষোভের সঞ্চারণ, কিংবা ক্ষোভ প্রকাশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তার কোনটারই মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেনি। সে সব রঙ্গালয়ে শুধু গতানুগতিক নাটকের

অভিনয় চলেছিল। আর এসব অভিনীত নাটকের অধিকাংশের মধ্যেই ছিল হতাশা, বিপর্যয়, হেরে যাওয়া যতসব অসম্পূর্ণ, বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধী মানুষের কথা। এসব চরিত্রের উপস্থাপনার মাধ্যমে দর্শক মনের সহানুভূতি ও সমবেদনা আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। বাণিজ্যিক থিয়েটার থেকে পরিপূর্ণ মানুষের কথা যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এসব নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে পেশাদার বাণিজ্যিক থিয়েটারগুলো জাঁক করে ব্যবসা চালাচ্ছিল। অবসাদগ্রস্ত এইসব পেশাদার নাট্যশালার মঞ্চসজ্জায় যে অবহেলা, অলস্য ও অমাজ্জনীয় রুচিহীনতা প্রকাশ পেত সেগুলি উৎপলকে ব্যথিত করে তোলে।

উৎপল দত্ত ছোটবেলা থেকেই তাঁর বাবা মা-র সঙ্গে কোলকাতার বাণিজ্যিক থিয়েটারগুলিতে অভিনয় দেখতে যেতেন। চল্লিশের দশকে স্টার থিয়েটারে মহেন্দ্রগুপ্তের পরিচালনায় অভিনীত নাটকগুলি দেখে তিনি অল্প বয়সেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাছাড়াও শ্রীরঙ্গম মঞ্চে শিশির কুমার ভাদুড়ীর অভিনয় ও প্রযোজনাও উৎপলকে মুগ্ধ করেছিল। বাণিজ্যিক থিয়েটারগুলিকে সম্মানের জায়গায় পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন একমাত্র শিশির বাবুই। এ প্রসঙ্গে উৎপল বলেছেন— “শিশির বাবুর অভিনয় ১৯৪৩ সাল থেকে নিয়মিত দেখেছি। শিশির বাবুর প্রভাব তো নিশ্চই তাঁর পরে যারা এসেছেন প্রত্যেকের উপরেই রয়েছে। থিয়েটারকে তিনি বাণিজ্যিক নরক থেকে তুলে একটা বুদ্ধির, একটা..... দর্শককে বুদ্ধির খরচ করতে বাধ্য করতেন।”^{৮৮} শিশির কুমার ভাদুড়ীর প্রভাব যে উৎপলের নিজের নাট্যজীবনেও পড়েছিল তা এ উক্তির মাধ্যমেই বোঝা যায়।

ছোটবেলা থেকে পেশাদার বাণিজ্যিক থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা ও সমকালের পরিস্থিতি—“এসব কারণেই ব্যবসায়িক পেশাদার রঙ্গালয়ের অভিনয়ে একটা গোপন অভীপ্সা তাঁর মধ্যে কাজ করে চলেছিল। থিয়েটারকে পুরোপুরি পেশাদার না করলে তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে না বলে উৎপল মনে করতেন।”^{৮৯} তাই ১৯৫০ সালের গোড়া থেকে প্রায় দশ বছর বন্ধ হয়ে থাকা মিনার্ভা থিয়েটারে উৎপল তাঁর লিটল থিয়েটার গ্রুপ নিয়ে নিয়মিত অভিনয় করবেন বলে মনস্থ করেন। ১৯৫৯ সালে ৩রা জুলাই সে কারণেই উৎপল ‘মিনার্ভা’ থিয়েটার ৯৯ বছরের জন্য লীজ নিলেন। চালু করলেন মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁর লিটল থিয়েটার গ্রুপের অভিনয়ের গৌরবময় ইতিহাস। “১৯৫৯ এর জুলাই মাসে ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’ মিনার্ভা পেল। দ্বারোদঘাটন হলো ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, মধুসূদনের ‘বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌ’ নাটক দিয়ে।”^{৯০}

নাটকের জন্য পুরো সময় দেওয়ার কারণেই এ সময়ে তিনি টিভিলি পার্কের বাসা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মিনার্ভার তিন তলায় বসবাস শুরু করেন। একই কারণে এর আগে তিনি সাউথ পয়েন্ট স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেন। এবার তিনি নাট্য প্রযোজনার কাজে পুরোপুরি নিযুক্ত হয়ে

যান। উত্তর কোলকাতার বাণিজ্যিক থিয়েটারের পরিমণ্ডলে ‘মিনার্ভা’ ভাড়া নিয়ে এবারে উৎপল তাঁর নিজের নাট্য দল, নিজের থিয়েটার হল ও তার সঙ্গে নিয়মিত পেশাদারী পদ্ধতি অবলম্বন করে শনি, রবি ও বৃহস্পতিবারের প্রথানুগ অভিনয়ের ধারাবাহিক ব্যবস্থা করলেন। মিনার্ভা থিয়েটার এবং লিটল থিয়েটার গ্রুপ-এর সম্মিলনে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে নাট্যভিনয়ের এক প্লাবন শুরু হয়ে গেল। আগেই দেখা গেছে যে, আন্তর্জাতিক অভিধায় লিটল থিয়েটার আন্দোলনের মধ্যেই ‘অ্যাম্প্রা’ কথাটি জড়িয়ে ছিল কিছুটা ‘অ্যামেচার’ এবং কিছুটা ‘প্রফেশনাল’—এই দুইয়ের সংমিশ্রণে লিটল থিয়েটার ‘মেইন স্ট্রিম থিয়েটার’-এর বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদ ও আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিল। উৎপল দত্তের এল.টি.জি প্রতিষ্ঠার মূলে এই রকম একটা প্রবল ইচ্ছা সূপ্ত অবস্থায় ছিল। মিনার্ভাতে এসে তিনি অ্যামেচার নাট্যদলের নাট্য ভাবনাকে প্রফেশনাল থিয়েটারের আওতার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন।

“থিয়েটারের উৎপল তখন অনেকখানি গঠিত। শেক্সপিয়রের নাটক জেনেছেন, বুঝেছেন এবং বিশ্লেষণ করে সেই নাটকের প্রযোজনায় হাত পাকিয়েছেন। জিওফ্রে কেণ্ডালের সাহচর্যে ও শিক্ষায় নাট্যপ্রযোজনার ব্যাপকতর ও আধুনিকতম দিকগুলি অনুধাবন করেছেন। গণনাট্য সংঘের আওতায় রাজনৈতিক মানস পরিমণ্ডলকে থিয়েটারের বিষয় এবং উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করার বোধদীপ্ত হয়েছেন। এইসব ভাবনার সমীকরণ সঙ্গে করেই উৎপল তাঁর লিটল থিয়েটার গ্রুপ নিয়ে মিনার্ভায় অভিনয় শুরু করলেন।”^{১১}

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় ‘বহুরূপী’ নাট্যগোষ্ঠী মিনার্ভায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁদের প্রযোজনায় সেখানে ‘রক্তকরবী’ নাটক মঞ্চস্থও করা হয়। কিন্তু ব্যবসায়িক থিয়েটারে সুবিধে করতে না পেরে শম্ভু মিত্র ও ‘বহুরূপী’ মিনার্ভা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরকম একটা অবস্থায় উৎপল দত্ত মিনার্ভায় এলেন। সঙ্গে যারা সাহস যুগিয়েছেন তাঁরা হলেন — শোভা সেন, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, নীলিমা দাস প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ। তাছাড়া সহকর্মী হিসেবে ছিলেন—আলোকপাতে তাপস সেন, মঞ্চসজ্জায় নির্মল গুহ রায় ও সুরেশ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ।

উৎপল দত্তের পরিচালনায় এল.টি.জি মিনার্ভা ভাড়া নিয়ে ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ক্রমশ অনেক নাটক সাফল্য জনক ভাবে অভিনয় করে গেছেন। এসব নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে উৎপল দত্ত পেশাদারি থিয়েটারের জগতে এক নতুন ভাবের উন্মাদনা ও উদ্দীপনার জোয়ার নিয়ে আসেন। “রাজনৈতিক ভাবনা চিন্তার প্রসারে ও চেতনার বিকাশে

এল.টি. জি -এর প্রযোজনা গুলি থিয়েটারে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। অভিনয়ে, পরিচালনায়, দৃশ্যসজ্জায় সেট নির্মাণে, আলোক সম্পাতে এবং নাট্যবিষয়ের গুরুত্বে সেদিন মিনার্ভা জনকল্লোলমুখী হয়ে উঠেছিল।”^{৯২}

কিন্তু এসময়ে সারা বাংলা জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে। প্রশাসন ও মস্তান সহযোগে থিয়েটারের ওপর দমন-পীড়ন চলতে থাকে। নাটক দেখতে আসা দর্শকরাও হামলার মুখে পড়ছে। পেশাদারী থিয়েটারের মধ্যে কেবল মিনার্ভাতেই গোলমালের সৃষ্টি করছে। অভিনেতা-অভিনেত্রী পরিচালক কলাকুশলীদের ওপর আক্রমণ চলে। এই আক্রমণ শুরু ‘অঙ্গার’ নাটকের দ্বিতীয় দফায় অভিনয়ের শুরু থেকেই। তাছাড়া গ্রুপের মধ্যেই রাজনৈতিক মতভেদ ও থিয়েটার মালিকের কাছে অনেক ঋণের বোঝা। নিজের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এবং পশ্চিমি ব্যবসায়িক সিনেমার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা—এসব কারণে উৎপল দত্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং তার নাট্যদল বিপর্যয়ের মুখে পড়ল। অবশেষে ১৯৬৯ সালে এল.টি.জি মিনার্ভা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। “ভেঙে গেল লিটল থিয়েটার গ্রুপ”। শেষ হলো উৎপল তথা ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’ -এর মিনার্ভা পর্ব।”^{৯৩} ‘মিনার্ভা’ ছাড়লেও উৎপল ও তাঁর নাট্যদল এল.টি.জি. -র অবদানে ‘মিনার্ভা’ আজও এক উচ্চতর মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। কেননা—“এল.টি.জি এই মিনার্ভাকেই নতুন যুগের থিয়েটারের ‘প্রাণস্থল’ করে দিয়ে গেছে।”^{৯৪}

বিবেক নাট্যসমাজ পর্ব : পঞ্চাশের দশকের শেষের দিক থেকেই এদেশের যাত্রার পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। পুরোনো প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতির পরিবর্তন করে যাত্রা প্রয়োগ ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে আধুনিক থিয়েটারের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছিল। আধুনিক নানা উপকরণ, উন্নত টেকনোলজির বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং থিয়েটারের প্রভাব যাত্রাকে অনেক উন্নতমানের করে তুলেছিল। ঠিক এরকম একটা সময়ে উৎপল দত্ত নিজেকে শুধু থিয়েটার চর্চার গভীর মধ্যেই আটকে রাখেননি। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের মতো যাত্রা আন্দোলনও সম্ভব কিনা তা নিয়ে তিনি সচেতন ভাবে নানা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, “যাত্রার মতো মাধ্যম তো আমাদের আর নেই। যাত্রা থিয়েটারের চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী মাধ্যম। অনেক বেশী মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম। সুতরাং যাত্রাতেও আমাদের সমানে লড়াই চালিয়ে যাওয়া উচিত।”^{৯৫} কেননা, যাত্রার দেশজ ভঙ্গি, তার অমেয় প্রাণপ্রাচুর্য, শক্তি ও বলিষ্ঠতার বেগ জনসাধারণের মনকে গভীর ভাবে আলোড়িত করে। আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে উৎপল দত্ত মিনার্ভা থিয়েটারের ভাঙন পর্বে ‘বিবেক নাট্যসমাজ’ গঠন করলেন। টালিগঞ্জ অগ্রগামী ক্লাবের

উদ্যোগে তাদের খেলার মাঠে বিবেক যাত্রা সমাজের প্রথম অভিনয় হয় ‘শোনরে মালিক’ নাটকের। অভিনয় কাল ৩১.১২.১৯৬৯ এবং পরের দিন অর্থাৎ ১.১.১৯৭০ -তে অভিনীত হয় ‘রাইফেল’ নাটক।”^{৯৬} “‘রাইফেল’ যাত্রাপালা প্রয়োজনা করে নিউ আর্থ অপেরা, পঞ্চু সেনের অভিনয়ে এবং রচনা ও প্রয়োগে বাংলা যাত্রা প্রবাহে নতুন তরঙ্গ তুলল।”^{৯৭}

এরপর ১৯৬৯-১৯৮৮ সাল এই কুড়ি বছরে উৎপল বাইশটি যাত্রাপালা রচনা করেন এবং যাত্রার সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন ‘লোকনাট্য’, ‘গণবাণী’, ‘তরণ অপেরা’ প্রভৃতি প্রখ্যাত যাত্রাদলগুলি উৎপলের যাত্রাপালাগুলির অভিনয় করে। নাটকের মতো তিনি যাত্রাপালা রচনার ক্ষেত্রেও দেশ-বিদেশের, সমকাল- অতীত কাল, যে কোন বিষয়ই গ্রহণ করুন না কেন, তার মূলেই ছিল মানুষের সংগ্রামের কথা। যাত্রা জগতের ক্ষেত্রেও বিষয় নির্বাচনের এই নতুন হু এদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরের জনমানসকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল।

“উৎপলদত্ত একেবারে প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট, প্রচণ্ডভাবে সমকাল-অতীতকালের রাজনৈতিক বিষয়কে তাঁর যাত্রাপালায় বিষয় করে তুললেন।উৎপল দত্ত যাত্রা জগতের ভাবনার স্তরের সীমাবদ্ধতাটাকেই আমূল পাণ্টে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বাংলার যাত্রা পালায় প্রত্যক্ষ রাজনীতি এবং রাজনীতি সচেতন যাত্রাপালা রচিত ও অভিনীত হতে থাকে।”^{৯৮}

উৎপল গণনাট্য সংঘে এসে পেয়েছেন জনতার স্বাদ তাদের মুখরিত সখ্য। গণনাট্য হিসেবে যাত্রার শক্তি সম্পর্কেও অবহিত হয়েছেন। তখন থেকেই তিনি যাত্রা নিয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকেন। তাই বিষয় বৈচিত্র্যে এদেশ-বিদেশের কথা ইতিহাস ও সমকাল সবকিছুকেই তিনি যাত্রা রচনার বিষয়ের মধ্যে নিয়ে এসে যাত্রার দর্শকদেরও উদ্বোধিত করেছেন। “স্বাধীনতা যুদ্ধ, জাতীয়তামুক্তিযুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, শ্রেণী সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কিংবা সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রাম এর কোনটাই বিষয় হিসেবে খুব একটা সহজ সরল নয়। অথচ সাধারণ মানুষ তাকে বিপুল ভাবেই গ্রহণ করেছেন।”^{৯৯}

যাত্রার অভিজ্ঞতা উৎপলকে থিয়েটার প্রয়োজনার আঙ্গিক পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর নাটকের বিষয়বিন্যাসের ক্ষেত্রেও যাত্রার বিষয়বিন্যাস বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। যাত্রা রচনা ও পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি যাত্রা জগৎকে যেমন অনেক কিছু দিয়েছেন, তেমনি আবার যাত্রা জগতের অভিজ্ঞতা থেকেও গ্রহণ করেছেন অনেক কিছু তাঁর নাট্য প্রয়োজনায়। যাত্রা এবং থিয়েটার উভয় ক্ষেত্রেই উৎপলের অভিজ্ঞতা থাকলেও সবকিছুর মধ্যেই সবসময় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নিজস্ব ভাবনা ও উপস্থাপনা। যাত্রার মাধ্যমে উৎপল যা শিখতে পেরেছেন। সে

বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন—

“শিখবেন নাট্যরচনার কৌশল, লক্ষ মানুষকে শিক্ষাদানের কলা, উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা সাজাবার পদ্ধতি। শিখবেন মধ্যবিত্ত দর্শকদের ছেড়ে অন্যান্য শ্রেণীর কাছে যাওয়া। কোমর বেঁধে যাত্রার কাছে শিখতে শুরু করুন সহজবোধ্য ভাষায় সহজগ্রাহ্য গল্পের পরিকাঠামোয় কি করে মহত্তর চিন্তা যোজনা করা যায়।”^{১০০}

থিয়েটারের পাশাপাশি যাত্রা শিল্পও একটা নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠা পাবে উৎপল দত্ত তা আশা করেছিলেন। আর সেই কারণেই তিনি যাত্রা আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যে আন্দোলন অনেকটা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন বা গণনাট্য আন্দোলনের মতো হবে। তিনি এমনটাও আশা করেছিলেন যে, গণনাট্যের মতো গণযাত্রাও নির্মাণ হতে পারে— যার শেষ কথা হচ্ছে রাজনৈতিক যাত্রা। তাঁর মতে প্রত্যক্ষত রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে যাত্রাকে। যাত্রা জগতের এই প্রভাব দেখা যায় উৎপলের পিপলস লিটল থিয়েটার পর্বে। সেখানে তিনি নাট্য নির্মাণ করেন যাত্রার প্রভাবে এবং নাট্য প্রযোজনা করেন নিরাভরণ সহজ সরল যাত্রার ফর্মে। নাটকের বিষয় রাজনীতি এবং বৃহত্তর জনমানসের কাছে যাওয়ার আশ্রয় তাগিদেই তা গঠিত।

এক সাক্ষাৎকারে উৎপল তাঁর যাত্রা সম্পর্কে ও নবীন নাট্যবোধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। সেখান থেকেই পিপলস লিটল থিয়েটার পর্বে উৎপলের নবীন নাট্যবোধ ও প্রযোজনার ভঙ্গির মানসিকতাটুকু বোঝা যায়।

“আমার এই থিয়েটার যাত্রার কোন রকমফের নয়, বরং এক সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শিল্পরূপই। তবুও বলতে পারি, এই থিয়েটারে আমি নিয়ে এসেছি সেই উত্তেজনার খানিকটা যা আমি জনসাধারণের নিকটসান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেই অভিজ্ঞতা থেকে এক ভিন্ন মনোভাব আয়ত্ত্ব করেছি। আমি ক্রমশই আরো বেশি করেই এমন এক থিয়েটারের প্রয়োজন অনুভব করছি যা হবে একাধারে গণগামী ও উর্ধ্বগামী; যে কুসংস্কার মতে অতিসূক্ষ্মের স্বাদ আহরণ করতে জনগণকে উর্ধ্বগামী হতে হবে, সে কুসংস্কারকেও আমি অস্বীকার করি।”^{১০১}

‘বিবেক নাট্যসমাজ’ উৎপল দত্ত ও তাঁর নাট্যজগৎকে বিশেষ ভাবে প্রগতিশীল আধুনিক মানের চিন্তা-ভাবনা বা পরীক্ষা নীরিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিল একথা মানতেই হয়। এল.টি.জি থেকে উৎপলের পি.এল.টি তে পদার্পণের সময়ে ‘পিপলস’ কথাটি যুক্ত হল। আর এই দুই-এর মাঝে সেতু বন্ধ হিসেবে কাজ করেছে ‘বিবেক নাট্যসমাজ’। যা হোক এই ‘বিবেক নাট্যসমাজ’ বেশি

দিন স্থায়ী হয়নি, বাণিজ্যিক দিক থেকেও কোন সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। উৎপল তার নাট্যজীবনে ‘বিবেক নাট্যসমাজ’-এর অবদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন—“শুধু পিপলস্ লিটল থিয়েটার ও তার প্রাণশক্তি সংগ্রহের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে সমৃদ্ধ করেছে এই বিবেক নাট্যসমাজের অভিজ্ঞতা।”^{১০২}

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উৎপল ‘বিবেক নাট্যসমাজ’ যাত্রাদলের হয়ে নিজের দুটি পালা অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু অন্য কোন যাত্রা দলের হয়ে অভিনয় করেননি। বরং অন্যদলের জন্য পালা রচনা করেছেন, নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন, পারফর্মিং আর্টের প্রায় সব মিডিয়াতেই উৎপল অভিনয় করে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। কেবল তাঁর অভিনয় জগৎ থেকে বঞ্চিত থেকে গেল এই যাত্রাজগৎ।

পিপলস লিটল থিয়েটার পর্ব : যাত্রা যখন উৎপলকে জনসমাজের কাছে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় হাজির করল, যাত্রার কৌশল তার ফর্ম, তার নাট্যনির্মাণ এবং জনসমষ্টির সঙ্গে মুহূর্মুহু সংযোগের এক বাতাবরণ তাঁকে নতুন করে নাট্যরচনা ও প্রযোজনায় নিমগ্ন করল তখন এই যাত্রার প্রভাবেই তাঁর নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হল। এত দিনে তাঁর এবং তাঁর দলের মধ্যে মতাদর্শগত অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই ১৯৬৯ সালে এল.টি.জি ভেঙে দিলেন এবং সে বছরেই ১৮ই মে তে নতুন করে গড়ে তুললেন পিপলস্ লিটল থিয়েটার। দলটি নথিবদ্ধ হল ১৯৭১ সালের ১৯ অক্টোবরে, আন্তর্জাতিক লিটল থিয়েটার আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাতে জুড়ে দিলেন ‘পিপলস’ শব্দটি। “শুধু নাটকাভিনয় দিয়েই আন্দোলন নয়, এই আন্দোলনের সঙ্গে জনগণকে জুড়ে নিতে হবে। ‘পিপলস’ কথাটি, না জুড়লে নাট্য আন্দোলনের চরিত্রটাই বোঝা যাবে না। দলের নাম এবং কর্ম প্রক্রিয়ার ভাবনার সঙ্গে একাকার হয়ে গেল ‘পিপলস’ শব্দটির ব্যঞ্জনা।”^{১০৩} এই পি.এল.টি পর্যায়েই রাজনৈতিক থিয়েটারের বিস্তৃত ও ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল উৎপল দত্তের নাট্য রচনা ও নাট্য প্রযোজনায়।

উৎপলের নাট্য জীবনে আর এক নতুন ভাবনার হাতিয়ার হয়ে উঠল এই ‘পিপলস লিটল থিয়েটার’। এ নাম গ্রহণের ব্যাখ্যায় উৎপল দত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

“কেননা ততদিনে মনে হচ্ছে ‘পিপলস্’ কথাটা সর্বত্র জুড়ে দেওয়া উচিত, কেননা, লিটল থিয়েটার যে আন্দোলন ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল ১৯০৫ সালে সেটা ছিল শুধুই এক্সপেরিমেন্ট ফর এক্সপেরিমেন্টস্ সেক; পরীক্ষামূলক নাটকের জায়গা। কিন্তু আমাদের যেটা মতবাদ, মতাদর্শ এখন অনেক পাল্টে গেছে। আগে ‘পিপলস্’ কথাটা না নিয়ে

এলে আমাদের উদ্দেশ্যই পরিষ্কার হচ্ছে না দর্শকের কাছে।”^{১০৪}

এছাড়া দলের মধ্যে মতান্তর, এল.টি. জি -এর বিরাট দেনার ভার, এসব কারণেও নামের পরিবর্তন করাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

এতদিন এল.টি.জি -র বাঁধা মঞ্চ ছিল মিনার্ভা। পি.এল. টি পর্যায়ে কোন বাঁধা মঞ্চ রইল না। তাই নাটক প্রয়োজনা মোবিলিটি ও ফ্লেক্সিবিলিটির কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয় মঞ্চও অতিক্রম উপস্থাপনার উপযোগী মঞ্চসজ্জা। অভিনয় শেষে সেগুলি যেন অতি সহজে অন্যত্র খুলে নিয়ে যাওয়া যায়। যাত্রার অভিজ্ঞতাই উৎপল দত্তকে একাজে সাহায্য করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এছাড়াও এ পর্বে উৎপলের নতুন সংযোজন অভিনেতা- অভিনেত্রী কিংবা সূত্রধার বা বিবেক জাতীয় চরিত্রের কণ্ঠে গানের প্রয়োগ, যা আগে প্রায় ছিলনা বললেই চলে। এর আগে দেশী-বিদেশী সংগীতের সুর, নানান বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করে তিনি নাটকের আবহ সংগীতের সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন সংগীতজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে। “কিন্তু যাকে বলে মঞ্চগীতি, যা কিনা বাংলা নাটকের ঐতিহ্যগত প্রাণ এবং বাঙালির যাত্রাপালার মূলধন, তার ব্যবহার সচেতন ও সচেষ্টিভাবে দেখা গেল পি. এল.টি পর্বে।”^{১০৫} উৎপল দত্ত এবার যাত্রা পালার অপেরাটিক কোয়ালিটিকে সুনিপুণ ভাবে ব্যবহার করলেন তাঁর থিয়েটারে।

সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তাল রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে উৎপল তাঁর পি.এল.টি নিয়ে পুরোপুরি নাট্যপ্রয়োজনায়ে নিমগ্ন হলেন। এবারে তাঁর থিয়েটারে শুধু পুরোনো ইতিহাস বা অনতিইতিহাস নয়- সরাসরি সমসাময়িক ঘটনার দ্বন্দ্বগুলি তিনি তাঁর নাটকে তুলে ধরলেন।

“এদেশ-বিদেশের যেখানেই মেহনতি মানুষের বিপক্ষে অত্যাচার সংগঠিত হয়েছে, উৎপল দত্ত থিয়েটারে তার বিষয়কে নিয়ে প্রতিবাদী নাটক মঞ্চস্থ করে চললেন। মার্কসবাদ-লেলিনবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত উৎপল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্যদিয়ে সমাজ ব্যঞ্জনার বিশ্লেষণ শুরু করলেন। সংগ্রামী ইতিহাসকে জনচেতনার সামনে উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত করলেন।”^{১০৬}

১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের বাংলার সেই ভয়ঙ্কর কালো দিনগুলিতে পুলিশ-প্রশাসন, গুণ্ডা, মাস্তান এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বহুমুখী আক্রমণে মানুষ যখন বিভ্রান্ত; মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তখন কোন রকমে বেঁচে ওঠার চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ নিত্যদিনের ঘটনা। এরকম একটা রাজনৈতিক অস্থিরময় পরিবেশে উৎপল দত্ত আবার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগদান করলেন। এর আগে ১৯৪৮ সালে যখন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যায় তখনও উৎপল অবিভক্ত কমিউনিস্ট

পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়েছিলেন নাট্যকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তিনি দুবার কারারুদ্ধও হয়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট রাজনীতিভাবাপন্ন উৎপল তাঁর জীবনের কখনই কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যভুক্ত অর্থাৎ ‘পার্টির কার্ড হোল্ডার’ হননি।

পি.এল.টি পর্বে শুরু হল উৎপল দত্তের পুরোপুরি রাজনৈতিক থিয়েটারের পর্ব। একদিকে মার্কসবাদ, অন্যদিকে ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে গড়ে উঠেছিল তাঁর মতাদর্শ। ব্যক্তি জীবনের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যজীবনেও তিনি আদ্যন্ত রাজনীতির অংশীদার। তিনি নিজেকে পার্টিজান হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর নাট্যকলা শুধু শিল্পকলার সহচর হিসেবে গড়ে ওঠেনা, তিনি সেখানে প্রোপাগান্ডিস্ট হিসেবেই নাট্যকলাকে গড়ে তুলতে চান। তিনি মনে করেন রাজনৈতিক নাটকের মূল লক্ষ্য শুধু রাজনৈতিক ঘটনার পরপর ছবি এঁকে যাওয়া নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত মানুষের ছবিও আঁকতে হবে। রাজনৈতিক ঘটনার বর্ণনার পাশাপাশি যে মানুষ সেই ঘটনা ঘটায় বা ঘটাতে সাহায্য করে এবং সমাজকে ও তার সঙ্গে নিজেকেও পরিবর্তিত করে সেই পরিবর্তমান মানুষের জীবনের সামগ্রিক ছবিও আঁকতে হবে। তাই দেখা যায় যেখানেই মানুষের উপর মানুষের কিংবা শাসন-অনুশাসনের অত্যাচার, উৎপল সেখান থেকেই তাঁর নাট্যবিষয় গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, নানা অত্যাচার- অবিচার প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে করতে মানুষই শেষ পর্যন্ত কীভাবে ইতিহাস তৈরি করে, সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লবের সেই কাহিনী তিনি তাঁর নাটকে বিধৃত করেছেন। ইতিহাসজ্ঞান ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে উৎপল দত্ত তাঁর নাট্যকাহিনীকে গড়ে তুলেছেন।

১৯৬৭-এর সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত বিভেদের কারণে তৃতীয় এক কমিউনিস্ট দল গঠিত হয় সি.পি.আই. (এম.এল.)। নকশালপন্থী রাজনৈতিক দল হিসেবে যার জনপরিচিতি। নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের মধ্যদিয়েই এই নবোদ্ভূত রাজনৈতিক দলটির কার্যারম্ভ। কমিউনিস্ট পার্টির সেই অতি বাম রাজনীতির সঙ্গে যখন উৎপল নিজেকে জড়ালেন, তখন স্বভাবতই তাঁর সৃষ্ট নাট্যদল তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে। বাইরের বিরুদ্ধ রাজনীতির চাপ, নাট্যদলের ভেতরে তাঁর প্রতি বিতর্কিত মনোভাব ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন এ সকল কারণে সে সময় উৎপল দত্ত মিনার্ভা ও এল.টি.জি. ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তখন তিনি সব হারিয়ে নিঃসঙ্গ এবং একক। তারপর তিনি ‘বিবেক নাট্যসমাজ’ নামে যাত্রা দল তৈরি করলেন। বাংলা যাত্রাপালায় রাজনৈতিক ভাবনার প্রসার ঘটাতে চাইলেন তিনি। কিন্তু যাত্রাদলকে চালনা করবার মতো সুযোগ ও ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই যাত্রা দল বন্ধ করে দিয়ে আবার নাট্যদল তৈরি করে নাটক অভিনয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। এ সময়ে তিনি সব দিক থেকেই জনসমর্থন হারিয়ে ফেলেছেন। তবুও তিনি তাঁর

নাট্যপ্রয়াস ও মার্কসবাদী ভাবাদর্শ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন হননি এই সংকটকাল থেকে উত্তরণের জন্য তিনি

“লিটল থিয়েটার এর সঙ্গে ‘পিপলস্’ জুড়ে ‘পিপলস্ লিটল থিয়েটার’ নাট্যদল তৈরি করে, প্রায় সব আনকোরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাহায্যে অভিনয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। সহকর্মী পত্নী শোভা সেন, বন্ধু সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস সেন, মনু দত্ত প্রমুখ সব সময়েই সঙ্গে রইলেন।”^{১০৭}

জীবনের সব রকম হতাশা বিরূপতা ও নিঃসঙ্গতাকে অতিক্রম করে কীভাবে আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানো যায়, নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়, সেই প্রচেষ্টায় সফল হয়ে তার উজ্জ্বল নজীর হয়ে রইলেন উৎপল দত্ত নিজেই। “অচিরাৎ ‘টিনের তলোয়ার’ -এর অভাবিত জনপ্রিয়তা তাঁকে পুনরায় জনতার মানস-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করল”^{১০৮} দেখা যায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তার দ্বিধা সরিয়ে আবার উৎপলের পাশে এসে দাঁড়াল। বৃহত্তর জনসমষ্টির মধ্যে যারা অ-রাজনৈতিক এবং প্রচুর বিরোধী মানুষ ছিলেন তারাও আবার উৎপলকে সাদরে গ্রহণ করে নিলেন। ‘শিল্পী তাঁর শিল্পীজীবনের সার্থক ব্যবহারেই নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। এই ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকটিই ছিল পি.এল.টি র প্রথম ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। অভিনয় কাল ১২ই আগস্ট ১৯৭১ সাল এবং স্থান রবীন্দ্র সদন।

এরপর পি.এল. টি কে কেন্দ্র করে উৎপল অনেক নাটক অভিনয় ও প্রায়োজনা করেছেন। এই “পি.এল.টি পর্যায়ে উৎপলের জীবনে মধ্য এবং অন্ত্য পর্ব। ... রাজনৈতিক থিয়েটার যতদূর যেতে পারে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল পি.এল.টি. তে।”^{১০৯}

উৎপল দত্ত বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে একটি যুগের ও একটি ধারার প্রবর্তক। বহুমানুষের বিচিত্র জীবনলীলার একটি বিশ্বাসযোগ্য জীবন্ত ছবি তিনি তাঁর নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর নাটক পড়তে পড়তে তাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়। বাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন ও নাট্য-আন্দোলনের ধারাকে তিনি এক সুতোয় গেঁথেছিলেন। উৎপল দত্ত সম্পর্কে মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় এক জায়গায় বলেছেন—“তাঁর শিল্পী মন রাজনৈতিক সত্তাকে বাদ দিয়ে নয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্ত বাঁক ও মোড়ের মধ্যে অবগাহন করেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমস্যা গুলিকে অনুধাবন করেই তিনি একজন শিল্পী।”^{১১০} কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ১৯৯৩ সালে এই শিল্পীকে আমরা হারালাম; হারালাম বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ও নাট্য আন্দোলনের এক পথ প্রদর্শককে। ১৯৭৬ সাল থেকেই তাঁর রক্তে সুগারের পরিমাণ বেশি ধরা পড়ে। ১৯৮৪ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর ‘দাঁড়াও পথিকবর’ নাটকের অভিনয়

কালে তাঁর মৃদু হার্ট অ্যাটাক্ট হয়। তারপর ক্রমে শারীরিক উন্নতি-অবনতির মধ্য দিয়ে অবশেষে “১৯ শে আগস্ট ১৯৯৩ পি.জি. থেকে ডায়ালিসিস করে ফিরে এসে বাড়িতে বেলা ৩-১০ মিনিটে মহাপ্রয়াণ।”^{১১১} তবে নৃপেন্দ্র সাহা তাঁর ‘উৎপল দত্তঃ সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি’ নাকম রচনায় উল্লেখ করেছেন বেলা ৩.৩০ মিনিটে উৎপলের মহাপ্রয়াণ হয়। মাত্র কুড়ি মিনিটের হেরফের রয়েছে দুটি তথ্যের মধ্যে। যাহোক দুটি তথ্যের ভিত্তিতে বলতে পারি বেলা তিনটার পরে এই মহান নাট্য ব্যক্তিত্বের দেহাবসান ঘটে। এ বিষয়টি পরিষ্কার। সমালোচক সৌমেন চট্টোপাধ্যায় উৎপল দত্ত সম্পর্কে বলেছেন—“বাংলা থিয়েটারে অগ্নিযুগের বিপ্লবী নায়ক তাঁর যে তরবারি নামিয়ে রেখেছেন সে শুধু ভবিষ্যতের সাগ্নিকদের উদ্দেশে।”^{১১২} সত্যিই তিনি বাংলা থিয়েটারের জগতের অগ্নিযুগের বিপ্লবী নায়ক ছিলেন, যাঁকে আজও আমাদের স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হতে দেখি।

এই বিপ্লবী নায়ক নিজেকে থিয়েটারের জগতে প্রকাশের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে থাকেন ১৯৪০-এর দশক থেকেই। ১৯৫০-এর দশকে তিনি গণনাট্য সংঘে যোগ দিলে তাঁর নাট্যভাবনার আরেকটি দিক পূর্ণতা পেল। ১৯৫৯ সালে মিনার্ভা পর্বে এসে এল.টি.জি কে সঙ্গে করে বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নাটকে ‘গোটা সম্পূর্ণাঙ্গ’ মানুষকে তুলে ধরলেন। এর আগে কেগুলের সংস্পর্শে এসে উৎপল একেবারে শিক্ষানবিশের মতো হাতে কলমে শিখতে শিখতে পরিণত হয়েছেন নাট্য প্রয়োজক, পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে। তার অনেক পরে তিনি নাটক লেখায় হাত দিয়েছেন এবং ধীরে ধীরে বলিষ্ঠ নাট্যকার হয়ে উঠেছেন।

উৎপল দত্ত শেক্সপিয়ার থেকে শিখলেন নাট্য গঠন, চরিত্র সৃষ্টি ও সংলাপ রচনার ক্রিয়া ক্রম। জিওফ্রে কেগুল ও তাঁর নাট্যদলের কাছে শিখলেন শেক্সপিয়ারের নাটকের অভিনয়ের নতুন নতুন পেশাদারি অভিজ্ঞতা এবং নাট্য প্রয়োজনার বিভিন্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক কলা কৌশল। ঠিক এরকম একটা সময়েই তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হন এবং গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এর ফলে তাঁর নাট্যজীবনে ক্রমশ বড় হয়ে উঠল নাটকে সমাজ মনস্কতা, নাট্যপ্রয়োজনা ও নাট্যরচনায় সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকটি। গণনাট্যের সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নাট্যাভিনয় শুধু বাংলা ভাষাতেই করলে চলবে না, তা করতে হবে প্রচুরতম দর্শকের জন্য। আর সেই নাটকের বিষয়বস্তু হবে জনগণের সর্বস্তরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংগ্রাম। আন্তর্জাতিক লিটল থিয়েটারের তথা ফ্রী থিয়েটারের সাযুজ্যও তিনি এই সময়ে উপলব্ধি করেছেন। এসব মিলিয়েই ভবিষ্যতের থিয়েটারের উৎপল তৈরি হয়েছেন এবং এভাবেই ক্রমে মানুষ উৎপল হয়ে উঠলেন নাট্যকার উৎপল দত্ত; বাংলা নাট্যজগতে যাঁর নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

উল্লেখপঞ্জি :

১. জোছন দস্তিদার, 'উৎপল দত্ত : এক আলোর নাম'; উৎপল দত্ত : এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, সম্পাঃ নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ১৬৪।
২. অপূর্ব দে (সম্পাদনা), টিনের তলোয়ার : ইম্পাতের তলোয়ার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, বড়দিন ২০০৭, কোল-০৯, পৃ. ২৩।
৩. 'পশ্চিমবঙ্গ' উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদকীয় অংশ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৪. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, ১০ অক্টোবর ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা - ০৯, পৃ. ৯।
৫. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, সপ্তম খণ্ড, পরিশিষ্ট অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৬৪৮।
৬. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, ১০ অক্টোবর ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা- ০৯, পৃ. ১১।
৭. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, 'উৎপল দত্ত : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি', উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ৭ম খণ্ড, পরিশিষ্ট অংশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৬৪৮।
৮. সাক্ষাৎকার : উৎপল দত্ত, দেশ, মার্চ, ১৯৯১, পৃ. ৩৪।
৯. উৎপল দত্ত, 'প্রতাপ রায়কে যেমন মনে পড়ে', 'এপিক থিয়েটার', সংখ্যা ১২, ৯১-২, ৯২, পৃ. ৩১-৩২।
১০. উৎপল দত্ত, 'লিট্‌ল্ থিয়েটার ও আমি', এপিক থিয়েটার, মে ১৯৭৭, পৃ. ৫০।
১১. সুরজিত ঘোষ, 'যে নাটকের রাজনীতি ভুল, তাঁর সব ভুল', সাক্ষাৎকার দেশ, ৩০.০৩.১৯৯১, পৃ. ৩৫।
১২. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, 'উৎপল দত্ত জীবন কথা' উৎপল দত্ত : এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, সম্পাঃ নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৫০৫।
১৩. তদেব, পৃ. ৫০৬।
১৪. তদেব, পৃ. ৫০৬।
১৫. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, 'উৎপল দত্ত জীবনকথা' উৎপল দত্ত : এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, সম্পাঃ নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৫০৬-৫০৭।
১৬. তদেব, পৃ. ৫০৭।
১৭. তদেব, পৃ. ৫০৭।
১৮. তদেব, পৃ. ৫০৭।

১৯. তদেব, পৃ. ৫০৭।
২০. তদেব, পৃ. ৫০৭।
২১. তদেব, পৃ. ৫০৭।
২২. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, এপিক থিয়েটার, মে, ১৯৭৭, পৃ. ৪৯।
২৩. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, ১০ অক্টোবর, ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-
০৯, পৃ. ১৭।
২৪. উৎপল দত্ত, শেক্সপিয়ারের সমাজ চেতনা, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোল- ৭৩,
চতুর্থ সংস্করণ, পৌষ ১৪০৫, পৃ. ৩।
২৫. অরূপ মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া,
নয়া দিল্লি - ১১০০৭০, পৃ. ৩৩।
২৬. অনুরাধা রায়, সেকালের মার্কসীয় সংস্কৃতি আন্দোলন, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০০,
পৃ.৯।
২৭. অরূপ মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া, নয়া
দিল্লি - ১১০০৭০, পৃ. ৬-৭।
২৮. অনুরাধা রায়, সেকালের মার্কসীয় সংস্কৃতি আন্দোলন, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০০,
পৃ.৩।
২৯. তদেব, পৃ. ৩।
৩০. অরূপ মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া,
নয়া দিল্লি - ১১০০৭০, পৃ. ২১।
৩১. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব
২০০৫ কমিটি, সম্পা: নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৪৪৩।
৩২. তদেব, পৃ. ৪৪৩।
৩৩. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, 'উৎপল দত্ত জীবন কথা' উৎপল দত্ত : এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত
নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, সম্পা : নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৫১৪।
৩৪. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব
২০০৫ কমিটি, সম্পা: নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৪৪৩।
৩৫. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, ১০ অক্টোবর, ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-
০৯, পৃ.১৪।

৩৬. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব
২০০৫ কমিটি, সম্পা: নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৪৪৪।
৩৭. তদেব, পৃ. ৪৪৪।
৩৮. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, 'উৎপল দত্ত জীবন কথা', উৎপল দত্ত : এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত
নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, সম্পা : নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৫১৫।
৩৯. তদেব, পৃ. ৫২৮।
৪০. তদেব, পৃ. ৫২৭।
৪১. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব
২০০৫ কমিটি, সম্পা: নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৪৪৪।
৪২. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, 'উৎপল দত্ত জীবন কথা' উৎপল দত্ত : এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত
নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, সম্পা : নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৫১৯।
৪৩. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, ১০ অক্টোবর, ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-
০৯, পৃ. ৩০।
৪৪. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব
২০০৫ কমিটি, সম্পা: নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৪৪৪।
৪৫. অরুণ মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া,
নয়া দিল্লি - ১১০০৭০, পৃ. ৪১।
৪৬. তদেব, পৃ. ৪১।
৪৭. সাক্ষাৎকার : ০৩-১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯, পরিগ্রাহকঃ শ্রী শমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শূদ্রক, সংকলন ১০,
শরৎ ১৪০০, পৃ. ১২৫।
৪৮. স্মরণিকা নাট্যোৎসব, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, ১৫-১৭ জুলাই, ১৯৫৭, রঙমহল।
৪৯. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব
২০০৫ কমিটি, সম্পা: নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৪৪৭।
৫০. "Ibsen's 'Ghost' in Bengali" The Statesman, 27.11.1950, Col-3, P.3.
৫১. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব
২০০৫ কমিটি, সম্পা: নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৪৪৭।
৫২. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত জীবন কথা, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব
২০০৫ কমিটি, সম্পাদিত নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৫৩৮।

৫৩. সরোজ দত্ত, 'সাংবাদিক', স্বাধীনতা, ১৪.১১.১৯৫২, পৃ.৩।
৫৪. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব
২০০৫ কমিটি, সম্পা: নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৪৪৬।
৫৫. তদেব, পৃ. ৪৪৬।
৫৬. তদেব, পৃ. ৪৪৯।
৫৭. অরুণ মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া, নয়
দিল্লি - ১১০০৭০, পৃ. ৬৪।
৫৮. উৎপল দত্ত, জনপ্রিয়তা ও আলমগীর, উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), নাট্য চিন্তা
দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৬।
৫৯. তদেব, পৃ. ৫২-৫৩।
৬০. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব
২০০৫ কমিটি, সম্পা: নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা- ৭৩, পৃ. ৪৪৮।
৬১. তদেব, পৃ. ৪৪৮।
৬২. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার, প্যাপিরাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট, ২০০৬, কোলকাতা-
০৪, পৃ. ৩০-৩১।
৬৩. শোভা সেন, স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড,
কলিকাতা- ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৩৭।
৬৪. তদেব, পৃ. ৩৯।
৬৫. তদেব, পৃ. ৩৮।
৬৬. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার, প্যাপিরাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট, ২০০৬, কোলকাতা-
০৪, পৃ. ১০৪।
৬৭. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-
০৯, পৃ. ৩৬।
৬৮. তদেব, পৃ. ৩৬।
৬৯. তদেব, পৃ. ৩৬।
৭০. দর্শন চৌধুরী, গণনাট্য আন্দোলন, অনুষ্ঠান প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, জুন, ১৯৯৪, কোল-০৯, পৃ. ০১।
৭১. শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসঙ্গঃ গণনাট্য, গণমন প্রকাশন, কলকাতা- ৫০, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ,
ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ. ১৪৭।

৭২. তদেব, পৃ. ১৫৪।
৭৩. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-০৯, পৃ. ১৮।
৭৪. তদেব, পৃ. ১৮।
৭৫. নৃপেন্দ্র সাহা, 'উৎপল দত্ত : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি', উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, সম্পাঃ নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৭৪।
৭৬. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, সম্পাঃ নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৪৬।
৭৭. সাক্ষাৎকার : প্রথম প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক 'পর্বাস্তুর' পত্রিকায়, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায়, দীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারটি পরে পুনঃমুদ্রিত হয় 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকার উৎপল দত্ত স্মারক সংখ্যায়, মার্চ, ১৯৯৪ সালে।
৭৮. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-০৯, পৃ. ২৩।
৭৯. 'গৌরচন্দ্রিকা' এপিক থিয়েটার, গণনাট্য সংঘ স্মৃতি সংখ্যা, মে, ১৯৭৭।
৮০. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-০৯, পৃ. ২৪।
৮১. তদেব, পৃ. ২৬।
৮২. উৎপল দত্ত, লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, সম্পাঃ নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৪৬।
৮৩. হীরেন্দ্রকুমার রায়, 'নাট্যকার উৎপল দত্ত', টিনের তলোয়ার : ইম্পাতের তলোয়ার, সম্পাঃ ড. অপূর্ব দে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, কোলকাতা-০৯, পৃ. ২৫।
৮৪. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-০৯, পৃ. ৩।
৮৫. দর্শন চৌধুরী, গণনাট্য আন্দোলন অনুষ্ঠান প্রকাশনী, কলিকাতা-০৯, দ্বিতীয় প্রকাশ, জুন, ১৯৯৪, পৃ. ১০।
৮৬. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, ১০ অক্টোবর, ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-০৯, পৃ. ৪।
৮৭. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার, প্যাপিরাস, ২য় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬, কোলকাতা-০৪, পৃ. ১২।
৮৮. সাক্ষাৎকার : দেশ, ৩০ মার্চ, ১৯৯১, পৃ. ৩৪।

৮৯. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল্লা উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-
০৯, পৃ. ৩৮।
৯০. তদেব, পৃ. ৪০।
৯১. তদেব, পৃ. ৪১।
৯২. দর্শন চৌধুরী, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-০৯, পৃ. ১৮৬-১৮৭।
৯৩. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল্লা উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-
০৯, পৃ. ১২৩।
৯৪. দর্শন চৌধুরী, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, পুস্তকবিপণি,
কোল-০৯, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৮৭।
৯৫. উজ্জ্বল হক, 'উৎপল দত্ত - থিয়েটারের এক অধ্যায়', 'শব্দ' সাহিত্য পত্রিকা, উৎপল দত্ত বিশেষ সংখ্যা,
২০১০, প্রকাশক - শ্রীমতী সুখীরাণী বড়ুয়া, কোলকাতা-২৮, পৃ. ২৭৪।
৯৬. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, 'উৎপল দত্ত : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ৭ম খণ্ড, পরিশিষ্ট
অংশ, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৬৫৩।
৯৭. নৃপেন্দ্র সাহা, 'উৎপল দত্ত : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি', উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত
নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, সম্পাঃ নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৭৭।
৯৮. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল্লা উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, ১০ অক্টোবর, ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-
০৯, পৃ. ১২৫।
৯৯. অনল গুপ্ত, 'অনুক্ৰমণিকা' অংশ, উৎপল দত্ত নাটকসমগ্র, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
কোলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০০, পৃ. ০৪।
১০০. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল্লা উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-
০৯, পৃ. ১২৭।
১০১. তদেব, পৃ. ১২৭-১২৮।
১০২. তদেব, পৃ. ১২৮।
১০৩. তদেব, পৃ. ১৩২।
১০৪. সাক্ষাৎকার : সুরজিৎ ঘোষ, দেশ, ৩০ মার্চ, ১৯৯১, পৃ. ৩৫।
১০৫. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়াল্লা উৎপল দত্ত, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০৭, পুস্তকবিপণি, কোলকাতা-
০৯, পৃ. ১৩২।
১০৬. তদেব, পৃ. ১৩৫।

১০৭. তদেব, পৃ. ১৩৯।

১০৮. তদেব, পৃ. ১৪০।

১০৯. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, 'উৎপল দত্তঃ সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি', উৎপল দত্তঃ নাটকসমগ্র, ৭ম খণ্ড, পরিশিষ্ট অংশ, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫৩।

১১০. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, 'কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে অবশ্য পাঠ্য বই' উৎপল দত্তঃ এক সামগ্রিক অবলোকন, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, সম্পাঃ নৃপেন্দ্র সাহা, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৩২২।

১১১. সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, 'উৎপল দত্তঃ সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি', উৎপল দত্তঃ নাটকসমগ্র, ৭ম খণ্ড, পরিশিষ্ট অংশ, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫৫।

১১২. তদেব, পৃ. ৬৫৫।
